INDIAN GOVERNMENT POLITICS

BA [Political Science]

Third Semester

Paper III

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Biswajit Gain

Prof. of Mahadebananda College

Author: Gobinda Naskar

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক	**(পৃষ্ঠা 1-54)**
১. ভারতীয় সংবিধানের বিকাশ ও সংবিধানের বৈশিষ্ট্য	
২. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তাৎপর্য	
৩. ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ	
৪. রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি এবং এর তাৎপর্য	
দ্বিতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 55 - 88)**
১. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি	
২. ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক	
৩. সংবিধান সংশোধন	
তৃতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 89 - 138)**
১.ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও রাজ্যের শাসন বিভাগ	
২. কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইন বিভাগ	
চতুর্থ একক	**(পৃষ্ঠা 139 - 196)**
১. সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট	
২. নির্বাচন কমিশন	
৩. রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা	
৪. ত্রিপুরার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা	

টিপ্পনী

সূচীপত্র

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-54)**

১. ভারতীয় সংবিধানের বিকাশ ও সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১.১ - ভুমিকা

১.২ - ভারতীয় গণপরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১.৩ - সংবিধানের রচনা ও গণপরিষদ

১.৪ - ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি

১.৫ - ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ নিবাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তাৎপর্য

২.১ - ভূমিকা

২.২ - ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

২.৩ - প্রস্তাবনার তাৎপর্য

২.৩.১ - সার্বভৌমত্ব

২.৩.২ - সমাজতন্ত্র

২.৩.৩ - ধর্মনিরপেক্ষতা

২.৩.৪ - গণতন্ত্র

২.৩.৫ - প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র

২.৩.৬ - ন্যায়বিচার

২.৩.৭ - স্বাধীনতা

২.৩.৮ - সাম্য

টিপ্পনী

টিপ্পনী

২.৩.৯ - ভ্রাতৃত্ব

২.৩.১০ - ব্যাক্তির মর্যাদা

২.৩.১১ - জাতির ঐক্য ও সংহতি

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩. ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার ও তার বৈশিষ্ট

৩.২.১ - সাম্যের অধিকার

৩.২.২ - স্বাধীনতার অধিকার

৩.২.৩ - শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার

৩.২.৪ - ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

৩.২.৫ - সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার

৩.২.৬ - সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

৩.৩ - ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

৩.৪ - অনুশীলনী

৩.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪. রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি এবং এর তাৎপর্য

৪.১ - ভূমিকা

৪.২ - নির্দেশমূলক নীতি সমূহ

৪.৩ - রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

৪.৪ - অনুশীলনী

৪.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

দ্বিতীয় একক (পৃষ্ঠা 55 - 88)

১. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

১.১ ভূমিকা

১.২ - ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশধারা

১.৩ - সংবিধান প্রণেতাগন ভারতে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন?

১.৪ - ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২. ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

২.১ - ভূমিকা

২.২ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৩ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৪ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৫ - কেন্দ্র-রাজ্য বিতর্ক : সারকারিয়া কমিশন

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী।

৩. সংবিধান সংশোধন

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - সংবিধান সংশোধনের অর্থ

৩.৩ - সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ও ভারত

৩.৪ - সংবিধান সংশোধনের মূল্যায়ন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

তৃতীয় একক (পৃষ্ঠা 89 - 138)

১.ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও রাজ্যের শাসন বিভাগ

১.১ - ভূমিকা

১.২ কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ

১.২.১ - রাষ্ট্রপতি

১.২.২ - প্রধানমন্ত্রী

১.৩ - রাজ্যের শাসন বিভাগ

১.৩.১ - রাজ্যপাল

১.৩.২ - মুখ্যমন্ত্রী

১.৪ - কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

১.৫ - রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২. কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইন বিভাগ

২.১ - ভূমিকা

২.২ - কেন্দ্রীয় আইসভা

২.৩ - রাজ্যের আইনসভা

২.৪ - আইনপ্রনয়ন পদ্ধতি

২.৫ - পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের বিশেষাধিকার

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - নির্বাচিতগ্রন্থপঞ্জী

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 139 - 196)

১. সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট

১.১ - ভূমিকা

১.২ - সুপ্রীম কোর্ট

১.৩ - হাইকোর্ট

১.৪ - লোকপাল

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২. নির্বাচন কমিশন

২.১ - ভূমিকা

২.২ - গঠন

২.৩ - ক্ষমতা ও কার্যাবলী

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩. রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

৩.৩ - রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

৩.৪ - তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪. ত্রিপুরার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

৪.১ - ভুমিকা

৪.২ - গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা

৪.৩- ত্রিপুরার পৌর শাসন

৪.৪ - ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (TTAADC)

৪.৫ - অনুশীলনী

৪.৬ -নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ভূমিকা

টিপ্পনী

বর্তমান সময়ে রাজনীতি চর্চা সকল ভারতীয়দের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের জনগণ ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে উৎসুক। এই আগ্রহকে কেন্দ্র করেই ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি চর্চা মানুষের কাছে ক্রমশ আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। তাই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরনে "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" গ্রন্থটির অবতারনা। এই গ্রন্থটির চারটি অধ্যায়ে ভারতের শাসন ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় গ্রন্থটি পরীক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঠ্যগ্রন্থ লেখা যে সহজ কাজ নয় তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। নতুন নতুন গবেষনালব্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, নতুন দৃষ্টি কোনের আবিষ্কার গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রকে অনেক কঠিন করে তুলেছে। তবে এতদসত্ত্বেও গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি। তবে গ্রন্থটি যাদের জন্য লেখা তাদের কাছে বোধগম্য হলেই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সফল হবে। শুধুমাত্র পাঠক্রম বোধগম্য করার জন্য নয়, পাঠক্রমের বাইরে সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ও গ্রন্থটি কার্যকর হবে আশা রাখি।

গ্রন্থটির রচনার ক্ষেত্রে বহু গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, বহুজনের উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। 'বিকাশ প্রকাশনা' সংস্থার কর্মীদের সহায়তার কথাও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরন করছি।

গ্রন্থটিকে ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে কিছু মুদ্রন সংক্রান্ত ও অন্যান্য ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি।

কলকাতা - ৭০০১০৪
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

গোবিন্দ নস্কর

টিপ্পনী

প্রথম একক

ভারতীয় সংবিধানের বিকাশ ও সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

টিপ্পনী

১.১ - ভূমিকা

১.২ - ভারতীয় গণপরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১.৩ - সংবিধানের রচনা ও গণপরিষদ

১.৪ - ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি

১.৫ - ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভূমিকা

সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন, তবে আইনসভা কতৃক রচিত আইনের সাথে সংবিধানের পার্থক্য আছে। সংবিধান হল বিশেষ এক ধরনের আইন যা আইনসভা কতৃক রচিত হয় না। সংবিধানের রচনার জন্য এক বিশেষ ধরনের আইনসভা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে গণপরিষদ বা সংবিধান সভা বলা হয় । বাস্তবে আইনসভা সব সময়ই আইন রচনা করে থাকে, মাঝে মাঝে আইনসভা রদ হলেও অবিলম্বে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালে ভারতে আইনসভা তথা সংসদ কার্যকর রয়েছে, অন্যদিকে ভারতের গণপরিষদ ১৯৪৬ সালে একবারই গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালে ভারতীয় জনগণের জন্য সংবিধান রচনার মাধ্যমে এই গণপরিষদের অবলুপ্তি ঘটে। অর্থাৎ সংবিধান সভার একমাত্র কাজই হল সংবিধান রচনা করা। প্রখ্যাত সংবিধান বিশারদ সুভাষ সি. কাশ্যপের (Subhas C. Kashyap) অনুসরণে বলা যায়-

"Generally, the task of forming the constitution ..... is performed by representative body of its people..... deted by the people for the purpose of considering and adopting a constitution

may be known as the constituent Assembly."

১.২ ভারতীয় গণপরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

টিপ্পনী

সংবিধান রচনার কাজ আরত তথা সমস্ত দেশের পক্ষেই ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ন। J. C. Johari তাঁর 'Indian Government and Politics' গ্রন্থে বলেন, "The single most important event of the present century should be discovered in the arising of our Fundamental Law by a grand constituent assembly that worked for a period of about three years to formulate the Basic Law of the land."

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয়দের নিয়ে ভারতীয় গণপরিষদ গঠনের দাবী উত্থাপিত হয়।

ভারতে সর্বপ্রথম গণপরিষদ গঠনের অপরিহার্যতা উচ্চারিত হয় ১৯২২ সালে। কারণ ১৯২২ সালে গান্ধিজী প্রথম 'ইয়ং ইন্ডিয়া' (Young India) পত্রিকায় স্বরাজ তথা সংবিধান রচনার দাবি জানান। তিনি বলেছিলেন যে, "ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপহার হিসেবে স্বরাজ আসবে না - ভারতের নিজস্ব সত্তার পূর্ন বিকাশের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতার আর্বিভাব ঘটবে।" ১৯২৩ সালে গান্ধিজী স্বরাজ্য দলের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব পেশ করে।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতে 'দ্বৈত শাসন' (Dyarchy) ও প্রদেশ গুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি শ্বেতপত্র (White paper) প্রকাশ করে। এই শ্বেত পত্রকে বিচার বিশ্লেষন করে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকে স্থির হয় ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্খা এই শ্বেতপত্রে প্রতিফলিত হয়নি ; সুতরাং এর একমাত্র বিকল্প হল ভারতীয় জনগণ কতৃক সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনা ও কার্যকর করা। এরপর থেকেই কংগ্রেস দল গণপরিষদ গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হলে ১৯৩৪ সালে কংগ্রসের নরমপন্থীরা তথা স্বরাজ্য পন্থীরা আইনসভার প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান

রচনার দাবিতে আইন সভায় সোচ্চার হন। ১৯৩৬ সালে ফয়েজপুরে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে গণপরিষদ গঠনের পক্ষে কংগ্রেস দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে। ১৯৩৬ সালের ২৯শে জুলাইয়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে গণপরিষদের দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

টিপ্পনী

গণতন্ত্রের রীতি অনুসারে কোন দেশের সংবিধান সেই দেশের জনগণের দ্বারাই রচিত হওয়াই কাম্য। দেশবাসীর পক্ষে সংবিধান রচনার অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ বর্তমান দেশগুলির জনসংখ্যা বিপুল। ভারতের জনসংখ্যাও বর্তমানে একশো কুড়ি কোটির ওপর। তাই গণপরিষদ তার কাজকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার জন্য কতগুলি কমিটি গঠন করে। এগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় - পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি এবং বিষয়গত কমিটি। পদ্ধতিগত কমিটির অধীনে ১০ টি এবং বিষয়গত কমিটির অধীনে ১২টি কমিটি গঠিত হয়। পদ্ধতি বিষয়ক কমিটি গুলির অন্তর্ভুক্ত কমিটিগুলি হল - কার্যবিবরনী সংক্রান্ত কমিটি, অর্থ ও স্টাফ কমিটি, পরিচিতি কমিটি, হাউস কমিটি, প্রেস কমিটি, বিধিসংক্রান্ত কমিটি, সভা-পরিচালন কমিটি, হিন্দি ভাষান্তর কমিটি, উর্দু ভাষান্তর কমিটি, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রভাব পরীক্ষন কমিটি। আর বিষয়গত কমিটি সমূহ হল - রাজ্য সংক্রান্ত কমিটি, পরামর্শদান কমিটি, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, কেন্দ্রীয় সংবিধান সংক্রান্ত কমিটি, প্রাদেশিক সংবিধান সংক্রান্ত কমিটি, খসড়া প্রনয়ন কমিটি, আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি, জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত কমিটি, ভাষা সংক্রান্ত কমিটি, সুপ্রীম কোর্ট সংক্রান্ত অস্থায়ী কমিটি ইত্যাদি।

তবে জে. সি. জোহারীর (J.C. Johari) মতে এই কমিটি গুলির মধ্যে খসড়া প্রনয়ন কমিটি ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বি. আর. আম্বেদকর এবং এই কমিটিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য "সংবিধানের জনক" (Father of the Constitution) বা "সংবিধানের প্রধান স্থপতি" (Chief Architect of the constitution) বলা হয়।

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে ৪টি মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে গণপরিষদ গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এতে বলা হয়-

(ক) ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে আসন পাবে। প্রতিটি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য প্রতি দশলক্ষ জনগণ পিছু

টিপ্পনী

১জন প্রতিনিধি গণপরিষদে পাঠাতে পারবে। মোট সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ জন।

(খ) গণপরিষদের আসনগুলি সাধারণ, মুসলিম এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টিত হবে। সাধারণদের জন্য ২১০ টি, মুসলিমদের জন্য ৭৮ টি এবং শিখদের জন্য ৪ টি আসন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। তাছাড়া ৯৩ জন সদস্য দেশীয় রাজ্য গুলি থেকে আসেন এবং দিল্লী, আজমির, মারওয়ার, কুর্গ ও ব্রিটিশ বালুচিস্তান থেকে একজন করে ৪ জন নির্বাচিত হবেন।

(গ) প্রাদেশিক আইনসভা গুলিতে অবস্থিত প্রতিটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন।

(ঘ) গণপরিষদের সাথে দেশীয় রাজাদের চুক্তিতে স্থির হয়, দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে যে ৯৩ জন সদস্য প্রেরন করা হবে, তার ৫০% নির্বাচিত ও বাকি ৫০% মনোনীত হবেন।

এই গণপরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন। তারা ২১২ টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২০৩ টিতে জয়লাভ করে। এছাড়া কংগ্রেস ৪ জন মুসলিম ও ১ জন শিখ প্রতিনিধিকে গণপরিষদে নির্বাচিত করতে সমর্থ হয়। ফলে ২৯৬ আসনের মধ্যে ২০৮ টি তে কংগ্রেসের জয়লাভের অর্থই হল ৭০% আসনে জয়লাভ। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের বিচার করলে দেখা যায়, ২৯২ টি সাধারন আসনে ২১০ জন ছিলেন হিন্দু, ৭৮জন ছিলেন মুসলিম, ৪ জন ছিলেন শিখ,। গণপরিষদে বহু প্রথিতযশা ব্যক্তি নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বি.আর. আম্বেদকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তেজ বাহাদুর সপ্রু, ডঃ রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ।

ভারতীয় গণপরিষদ গঠন : ১৯৪৬

নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ	আসনসংখ্যা
কংগ্রেস	২০৮
মুসলিম লীগ	০৭৩

ইউনিয়নিস্ট	০০১
ইউনিয়নিষ্ট মুসলিম	০০১
ইউনিয়নিষ্ট তপশিলী জাতি	০০১
কৃষক প্রজা পার্টি	০০১
তপশিলী জাতি ফেডারেশান	০০১
শিখ (অ-কংগ্রেস)	০০১
কমিউনিষ্ট	০০১
নির্দল	০০৮
	২৯৬
দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ	০৯৩
মোট	৩৮৯

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ন কমিটির সভাপতি ছিলেন নেহরু, নয় প্যাটেল অথবা ডঃরাজেন্দ্র প্রসাদ। এই তিন জনের সঙ্গে জি. সি. পন্থ, পট্টভি সীতা রামাইয়া, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী, আয়ার, এন. ঝি. আয়েঙ্গার, কে. এম, মুন্সি, বি. আর. আম্বেদকর ও সচ্চিদানন্দ সিংহ মিলিতভাবে গণপরিষদের অভিমুখ নির্দেশ করেন।

১.৩ - সংবিধান রচনা ও গণপরিষদ

গণপরিষদ গঠনের পর ও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়নি, তারা মিলিতভাবে কাজ করবে, সে সম্ভবনাও দেখা গেল না। এরকম অবস্থায় লর্ডওয়াভেল১৯৪৬ সালের২০ নভেম্বর ঘোষণা করলেন যে আগামী ৯ডিসেম্বর থেকে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হবে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

১৯৪৬ সালের ৯ডিসেম্বর বেলা ১১টায় দিল্লীর 'কনিস্টটিউশন' হলে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মুসলিম লীগের সদস্যরা এই অধিবেশনে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যোগদান করেননি। লীগের সদস্য ছাড়া ২০৭ জন সদস্য প্রতিনিধি গণপরিষদে যোগ দেন এবং আচার্য জে. বি. কৃপালিনীর প্রস্তাব অনুসারে পরিষদের প্রধানতম সদস্য শ্রী সচ্চিদানন্দ সিংহকে অস্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৬ সালের ৯ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। ১১ ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু 'উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব' (The Objective Resolution) উত্থাপন করেন। নতুন ভারত কেমন হবে, তার দলিল ছিল এই প্রস্তাবকে নর্মাম ডি. পাসার বলেন, "১৯৫০ সালের ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা এই দলিল অনুসারে রচিত হয়।" নেহরু উত্থাপিত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবটি তুলে ধরা হল:

"এই গণপরিষদ দৃঢ় ও পবিত্র সংকলন গ্রহণ করছে ভারতকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম, প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করতে এবং একটি সংবিধানের ভবিষৎ পরিচালনা ব্যবস্থা রচনা করতে, যেখানে সার্বভৌম স্বাধীন ভারতের এবং সরকারের সাংবিধানিক অংশ ও অঙ্গ সমূহের সমস্ত ক্ষমতা ও কতৃত্ব জনগণ থেকে লাভ করবে। যেখানে ভারতের সমস্ত জনগণের ন্যায়বিচার - সাম্প্রতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ; চিন্তা, মত-প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম, পূজা-উপাসনা, পেশা, সংগঠন ও খাজনা আইন ও সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত তার স্বাধীনতা ; এবং সেখানে সংখ্যালঘু, পশ্চাদপদ ও উপজাতি - এলাকাসমূহ এবং অবদমিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেনির যথেষ্ট রক্ষাকবচ থাকবে ; এবং যার দ্বারা এই প্রাচীন ভূমি পৃথিবীতে তার যথাযথ এবং সম্পাদিত স্থান লাভ করতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যানে পূর্ন এবং ইচ্ছামূলক অবদান রাখতে পারে।"

১৯৪৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর কে. এম. মুন্সী গণপরিষদের কার্য পরিচালন সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলে অভিহিত করার সুপারিশ করা হয়। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে মুসলিম লীগের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেননি, যাতে তারা কংগ্রেসে যোগ দেন তার জন্য ১৯৪৭ সালের ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন

১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ারি গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় এবং ২৬

জানুয়ারি পর্যন্ত তা চলে। বহু আলাপ আলোচনার পর আগের অধিবেশনে নেহরু কতৃক উত্থাপিত 'উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব' সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে পরিচালনা কমিটি সংখ্যালঘু পরামর্শদাতা কমিটি, মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কমিটির মত কতগুলি কমিটি গঠন করা হয়। এই অধিবেশনে হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে গণপরিষদের সহসভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। মুসলিম লীগ এই অধিবেশনে যোগদানেও অস্বীকার করে। তবে ভাইসরয় মাউন্টব্যটেন ভারত বিভাজনের রূপরেখা চূড়ান্ত করলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

টিপ্পনী

তৃতীয় অধিবেশন

গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন ২৪শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত চলে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি এবং মোলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন আলোচিত হয়। কেন্দ্রিয় ক্ষমতা কমিটির প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে স্থির হয় প্রতিরক্ষা, বৈদিশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে মৌলিক অধিকারকে দু'ভাগে ভাগ করা হব - আদালত কতৃক বলবৎযোগ্য ও আদালত কতৃক বলবৎযোগ্য নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও স্ত্রী - পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক এই মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। এই অধিবেশনেই রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রস্তাব অনুসারে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় সংবিধান রচিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চতুর্থ অধিবেশন

১৯৪৭ সালের ১৪ জুলাই গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১শে জুলাই পর্যন্ত তা কার্যকর থাকে। এই অধিবেশনে গণপরিষদ ইউনিয়ন সংবিধান সম্পর্কিত ও প্রাদেশিক সংবিধান সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও মোলিক অধিকার, সংখ্যালঘু উপজাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটি গুলির প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন রাষ্ট্র ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণর জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

টিপ্পনী

পঞ্চম অধিবেশন

ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসেবে যোগদান করায় ৬মাসের মধ্যেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর ও বিভাজনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ এর মধ্যরাত্রে গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এরপর ২০শে আগষ্ট থেকে২৯ আগষ্ট পর্যন্ত গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন চলে। ভারত ও পাকিস্তান দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ায় ভারতীয় গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ভারতের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়।

খসড়া কমিটি

১৯৪৭ সালের ২৯ আগষ্ট সংবিধান রচনার জন্য খসড়া কমিটি গঠিত হয়। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে খসড়া কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সঙ্গে এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে.এম. মুন্সী, ডি.পি. খৈতান, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও বি. এল মৈত্র খসড়া কমিটির সদস্য হন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে খসড়া কমিটি সংবিধানের প্রথম খসড়া রচনা শেষ করেন। প্রায় ৬০ টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে এই খসড়া রচিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই কমিটি গণপরিষদের রাষ্ট্রপতির কাছে খসড়া সংবিধান পেশ করে। এই খসড়া সংবিধানে ৩১৫ টি ধারা ও ১৩ টি তপশিল ছিল। খসড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য ৭৩৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তার মধ্যে ২৪৭৩টি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সংবিধান গ্রহণকালে ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তপশিল ছিল। ১৯৫০ সালকের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের সকল সদস্য সাক্ষর করেন এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাক্ষরের মাধ্যমে চূড়ান্ত সংবিধান প্রস্তুত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকর হয় এবং প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। খসড়া কমিটির ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন ধরে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হয়।

১.৪ ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি

সদ্য স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি কী হবে ? এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। যেমন কতটা প্রাচীন ধারনা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংযুক্ত করা হবে এবং কতটা

ব্রিটিশ ও পশ্চিমী মডেলের ভিত্তিতে কাঠামো গঠিত হবে? কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা হবে ? গান্ধীবাদী ধারনা ও আদর্শ কীভাবে রূপায়িত হবে ? এগুলিকে ভিত্তি করেই সংবিধানের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

নরম্যান ডি. পামার (Narman D. Palmar) বলেন, ভারতীয় রাষ্ট্র প্রকৃতিতে সাতটি মৌল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলি হল -

(ক) ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র থাকবে।

(খ) এটি একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে।

(গ) এটি প্রজাতন্ত্র হবে।

(ঘ) একটি লিখিত সংবিধান থাকবে।

(ঙ) কমনওয়েলথের সদস্য হবে।

(চ) একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

(ছ) জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র হবে।

এই রাষ্ট্রপ্রকৃতির প্রতিচ্ছবি সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক থেকে ভারতীয় সংবিধানকে শ্রমিক শ্রেনীর সংবিধান না বলে ধনতান্ত্রিক সংবিধান বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত । সংবিধানের প্রস্তাবনায় অবশ্য ভারতকে 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কতৃক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কতৃক 'গরিবি হটাও' বা 'বিশ দফা' কর্মসূচী ঘোষণায় ভারতে শ্রমিক শ্রেনীর সংবিধান প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষিত হলেও বাস্তবে ভারতে শ্রমিক শ্রেনীর সংবিধান নেই । এখানে ব্যাক্তিগত মালিকানা, বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগ প্রভৃতি পুঁজিবাদী সংবিধানের বৈশিষ্ট্য জাঁকিয়ে রয়েছে । আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (International Monitory Fund). বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগ বা উদারীকরন ভারতের সংবিধানকে অধিকতর পুঁজিবাদী পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করছে।

ভারতের সংবিধান লিখিত, সুপরিবর্তনীয় এবং পুঁজিবাদী চরিত্রের সমার্থক । তবে ভারতীয় সংবিধানের সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিচার করা এখনই সম্ভব নয়। এটা নির্ভর করে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেশের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর। তাই নরম্যান ডি. পামারের অনুসরনে বলা যায়, "বর্তমান ভারতে মানব ইতিহাসের এক অতীব তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রচন্ড আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বাধাকে অতিক্রম করে টিকে থাকার ন্যূনতম মানে পৌছোতে এবং সুস্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে প্রয়াসী এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তারা গণতান্ত্রিক পথকেই বেছে নিয়েছে।"

১.৫ - ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি দেশের একটি সংবিধান থাকে। তবে সব দেশের সংবিধান এক হয় না। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসক শ্রেনী তাদের ধ্যান ধারণা তথা স্বার্থের দিকে নজর রেখেই তাদের দেশের সংবিধান রচনা করেন। ভারত ও তার ব্যাতিক্রম নয়। যাইহোক, ভারতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী যে সংবিধান কার্যকর হয়েছে তার ও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমেই ভারতীয় সংবিধানের মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা অনস্বীকার্য। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে আলোচিত হল।

(ক) বৃহত্তম লিখিত সংবিধান

ভারতের সংবিধান আকারে পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হবার সময়ে সংবিধানে প্রস্তাবনা সহ ৩৯৫টি ধারা (Article) এবং ৮টি তালিকা (Schedule) ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে ভারতীয় সংবিধানের দীর্ঘতা সহজেই অনুমান করা যায়। মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গ্রহণকালে মাত্র ৭টি ধারা ছিল।

(খ) লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রন

পৃথিবীর সমস্ত লিখিত সংবিধানের মধ্যে ভারতের সংবিধান বৃহত্তম। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত লেখা থাকলেও সংবিধানে বেশ কিছু অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংবিধানে বেশ কিছু প্রথাকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। যেমন - ভারতের সংবিধানে বলা আছে , অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে

পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কোনো বিষয়ে ভোট গ্রহণের সময় লোকসভার সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এই ধরনের পরিস্থিতি গ্রেট ব্রিটেনের অনুসরনে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে। এই প্রথা গড়ে উঠেছে। তাই ভারতীয় সংবিধানকে শুধু লিখিত সংবিধান না বলে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের সংমিশ্রন বলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

টিপ্পনী

(গ) সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সমন্বয়

সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতের সংবিধানকে ব্রিটেনের মতো সম্পূর্ন সুপরিবর্তনীয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে দুস্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলেননি। ভারতের সংবিধানে নতুন রাজ্যের গঠন, সীমানা পরিবর্তন বা নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন প্রয়োজন। আবার সংবিধানের কিছু অংশ আছে যার পরিবর্তনে মোট সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদনের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনুমোদন ও আবশ্যক। অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় উভয় পন্থার অবলম্বন নেওয়া হয়।

(ঘ) ক্ষমতা স্মতন্ত্রীকরন নীতির অনুপস্থিতি

ভারতীয় সংবিধানে ইংল্যান্ডের অনুসরনে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। তাই ভারতের শাসন বিভাগে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সংসদের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। ইংল্যান্ডের মত ভারতেও সংসদ বলতে রাষ্ট্রপতি সহ সংসদকে বোঝায়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজের পদে ততদিন অধিষ্ঠিত থাকেন যতদিন তিনি লোকসভার আস্থাভাজন থাকতে পারে। সুতরাং সংবিধানে শাসন বিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা নির্ধারিত করলেও তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নি।

(ঙ) মৌলিক অধিকার

ভারতের নাগরিকদের ব্যাক্তিসত্তার বিকাশের জন্য সংবিধানে সাতটি মৌলিক অধিকারের কথা প্রথমে ঘোষিত হয়েছিল। বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার হিসেবে না থাকায় ভারতীয় নাগরিকগণ ছয় প্রকারের মৌলিক অধিকার যথা :

টিপ্পনী

সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মাচরনের অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার গুলি অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। নানা বিধিনিষেধ মেনেই এই অধিকারগুলিই ভারতীয় নাগরিকেরা ভোগ করে।

(চ) নির্দেশমূলক নীতি

আয়ারল্যান্ডের অনুসরনে রাষ্ট্রীয় নিদেশমূলক নীতির সংযোজন ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বিষয়। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬ - ৫১ নম্বর ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও আর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সমাজ বিজ্ঞানী অষ্টিন (Austin) এগুলিকে 'সামাজিক হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন।

(ছ) নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংবিধানে সাধারণত মৌলিক অধিকারের সাথে মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত করা হয়। ভারতের মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা ছিল না। পরবর্তীকালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানে ১০ টি মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা হয়। এগুলি চতুর্থ অধ্যায়ে ৫১(ক) নম্বর ধারায় সন্নিবেশিত। সম্প্রতি আরেকটি মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির মতো মৌলিক কর্তব্য আদালত কতৃক বলবৎ যোগ্য নয়।

(জ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ভারতে যুক্তরাষ্টের তিনটি মৌল বৈশিষ্ট্য -

(i) দুই শ্রেনীর সরকার - দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৯টি অঙ্গরাজ্যে প্রাদেশিক সরকার।

(ii) সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বন্টন - কেন্দ্রিয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতার বন্টন।

(iii) নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রিয় আদালত - ভারতে নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট বিদ্যমান।

(ঝ) পিরামিড সদৃশ বিচারব্যবস্থা

ভারতের সংবিধান অনুসারে সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রীম কোর্ট আর সর্বনিম্ন আদালত হল ন্যায় পঞ্চায়েত। ন্যায় পঞ্চায়েত থেকে ধাপে ধাপে উচ্চ বিচারালয়ের মধ্য দিয়ে রাজ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচার মেলে হাইকোর্টে। আবার হাইকোর্টের রায়ে অসন্তুষ্ট হলে সুপ্রীমকোর্টে । একারণেই ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে 'পিরামিড সদৃশ' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

টিপ্পনী

(ঞ) সংসদীয় গণতন্ত্র

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রে লোকসভার এবং রাজ্যে বিধানসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলই যথাক্রমে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার গঠন করে। যেমন ভারতে বর্তমানে (২০১৬) কেন্দ্রে বি.জে. পি. নেতৃত্বাধীন এন. ডি. এ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃনমূল কংগ্রেস দলের সরকার বিদ্যমান।

(ট) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

সংবিধানের ৭৯নং ধারা অনুসারে ভারতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে সংবিধান সংশোধন হওয়ায় বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৫২ জন। জনগণ দ্বারা ৫বছরের জন্য ৫৫০ জন সরাসরি নির্বাচিত এবং ২ জন রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত হতে পারেন। অন্যদিকে ভারতে দ্বিতীয় কক্ষ হল রাজ্যসভা এবং এই সভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা হল ২৫০ জন। তবে এর মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত হন। এঁদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। প্রতি ২ বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন তাই এটি স্থায়ী কক্ষ।

(ঠ) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

৩২৬ নম্বর ধার অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে ভোটাধিকারের ভূষিত করা হয়েছে। এক ব্যাক্তি এক ভোট নীতি গৃহীত হয়। ১৯৮৯ সালে ভোটাধিকারের বয়স সীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা

টিপ্পনী

হয়েছে।

(ড) একনাগরিকত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা সুইজারল্যান্ডের মত দ্বিনাগরিকতা ভারতে স্বীকৃত নয়। ভারতের জনগণ যে অঞ্চলেই থাকুক না কেন, তারা ভারতীয় নাগরিক অর্থাৎ ভারতে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বিনাগরিকতার পরিবর্তে একনাগরিকতাকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হলেন প্রথম নাগরিক।

(ঢ) জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা

বর্তমানে ভারতে অঙ্গরাজ্যের সংখা ২৯ এবং এর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর অন্যতম। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমন করে তখন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চুক্তি করে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কাশ্মীরের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়। যেমন - জম্মু - কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান গ্রহণ, পার্লামেন্ট অবশিষ্ট ক্ষমতা বলে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে পারেনা , রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি জম্মু ও কাশ্মীরে বলবৎযোগ্য নয় ইত্যাদি।

(ণ) ধর্মীয় নিরপেক্ষতা

মৌলিক অধিকারে স্বাধীন ধর্মাচরনের অধিকার থাকলে ও ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটির উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংশোধন আইনে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির সংযোজন হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্রের কোনো নিজস্ব ধর্ম থাকবে না, কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। সকল ধর্মই রাষ্ট্রের কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী।

(ত) পশ্চাদপদ্ শ্রেনীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য বিশেষ সংরক্ষন ব্যবস্থা। সংবিধানে তপশিলী জাতি (S.C),. তপশিলী উপজাতি (S.T) ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের (Anglo Indian) বিশেষ সুযোগ সুবিধা যথা নির্বাচিত হওয়ার জন্য লোকসভা ও বিধানসভায়

আসন সংরক্ষণ, পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা, সরকারি চাকরির একটা সুনির্দিষ্ট অংশের সংরক্ষন ইত্যাদি।

(থ) ভাষাপত্র

ভারতে বহু ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে। তাই ভাষার পক্ষে সংবিধান প্রণেতাগণ কোনো ঐক্যে পৌঁছতে পারেননি। সংবিধান অনুসারে 'হিন্দি' আমাদের সরকারি ভাষা, কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক মানুষ হিন্দি ভাষার কথা না বলায় ও বহু লোকের আপত্তি থাকায় 'হিন্দি' ভারতের পূর্নাঙ্গ সরকারি ভাষা হয়ে ওঠেনি। হিন্দির পাশাপাশি 'ইংরেজি' সরকারি ভাষার মর্যাদা ভোগ করে চলেছে।

টিপ্পনী

(দ) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা

সংবিধানে জরুরি বা সংকটকালীন অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য জরুরি অবস্থায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৬০ ধারা অনুসারে যথাক্রমে জাতীয় জরুরি অবস্থা, রাজ্য জরুরি অবস্থা ও আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় জাতীয় জরুরি অবস্থা, কাশ্মীরে ১৯৯৬ সালে রাজ্য জরুরি অবস্থা বলবৎ ছিল। তবে আর্থিক জরুরি অবস্থা এখনও পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি।

ভারতের সংবিধানের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন - সংবিধানের প্রাধান্য, দলত্যাগ বিরোধী আইন, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, বিশ্বশান্তির আদর্শ ইত্যাদি। ভারতীয় সংবিধান ব্রিটেনের সংসদীয় সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল অব রাইটস ও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি ও পশ্চিমী কাঠামোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠায় স্যার আইভর জেনিংস ও অন্যান্য তাত্বিকগণ ভারতীয় সংবিধানকে অভারতীয় বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু সময়ের নিরিখে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতের সংবিধান মৌলিক না হলেও এক সৃজনশীল দলিল যা ভারতের সাংবিধানিক প্রয়োজনকে যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

টিপ্পনী

১.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(ক) ভারতীয় গণপরিষদের গঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর?

(খ) খসড়া কমিটি কী? এর প্রধান কাজ কী ছিল?

(গ) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঘ) সংবিধান প্রনয়নে গণপরিষদের ভূমিকা কী ছিল?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(ক) ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি আলোচনা কর।

(খ) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য্য গুলির বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা কর।

(গ) গণপরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।

১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(ক) M.V. Pylee, "India's constitution", S. Chand and Co. New Delhi, 2001

(খ) J.C. Johari, "Indian Constitution and Politics", Vishal Publications, Jalandhar, 2001.

(গ) D.D. Basu, "Commentary on the Constitution of Indian" M.C. Sarkar and Co., Calcutta, 1965-68

(ঘ) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", মিত্রম্, কলকাতা, -২০১১

(ঙ) Bidyut Chakraborty & Rajendra kumar Pandey, "Indian Government and Politics", Sage Publication, New Delhi, 2008

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তাৎপর্য

টিপ্পনী

২.১ - ভূমিকা

২.২ - ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

২.৩ - প্রস্তানার তাৎপর্য

২.৩.১ - সার্বভৌমত্ব

২.৩.২ - সমাজতন্ত্র

২.৩.৩ - ধর্মনিরপেক্ষতা

২.৩.৪ - গণতন্ত্র

২.৩.৫ - প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র

২.৩.৬ - ন্যায়বিচার

২.৩.৭ - স্বাধীনতা

২.৩.৮ - সাম্য

২.৩.৯ - ভ্রাতৃত্ব

২.৩.১০ - ব্যাক্তির মর্যাদা

২.৩.১১ - জাতির ঐক্য ও সংহতি

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২.১ - ভূমিকা

বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত সংবিধান সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা (Preamble) থাকা। ১৭৮৯ সালে রচিত

টিপ্পনী

পৃথিবীর সবথেকে পুরনো মার্কিন সংবিধানের শুরুতেও একটা প্রস্তাবনা দেখা যায়। ভারতের সংবিধান ও এর ব্যাতিক্রম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও আয়ারল্যান্ডের অনুকরণে ভারতের সংবিধানেও একটি প্রস্তাবনার সংযোজন হয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা অনেকটা গ্রন্থের ভূমিকার মতো। গ্রন্থের ভূমিকা যেমন সংক্ষেপে পাঠকদের গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত করে, তেমনি সংবিধানের প্রস্তাবনা সংবিধানের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে নাগরিকদের পরিচিত করে। অধ্যাপক এম. ভি. পাইলি তাই বলেন, "Reading through the preamble, One can see the purpose that it serves, namely, the declaration of (1) the source of the constitution, (2) a statement of its objectives and (3) the date of its adoption". এককথায় বলা যায়, সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করলে সমগ্র সংবিধানের একটি দিশা পাওয়া যায়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা মূল সংবিধানের অংশভুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। কোনো গ্রন্থের ভূমিকা যেমন গ্রন্থের মূল অংশ বলে বিবেচিত হয় না সেই একই কথা প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রস্তাবনার কোনো আইনসক্রান্ত ভিত্তি নেই। গণপরিষদে বিতর্ক চলাকালিন আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার বলেন, 'প্রস্তাবনা' আইনের একধরনের ভূমিকা। সংবিধানের মূল অংশের সাথে প্রস্তাবনার বিরোধ বাধলে আদালত সংবিধানের মূল অংশকেই গ্রহণ করে।

২.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানে যে প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছিল তা ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা পরিমার্জিত হয়েছে । বর্তমানে সংবিধানের প্রস্তাবনা হল -

"আমরা ভারতের জনগণ সত্য, নিষ্ঠার সাথে সংকল্প করে ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং এর সকল নাগরিক যাতে

সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার;

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা;

মর্যাদা ও সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যাক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নিশ্চয়তা সাধন করার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য।

"আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি।"

টিপ্পনী

সংবিধানের প্রস্তাবনা দেখলে প্রথমেই 'আমরা ভারতের জনগণ' এবং প্রস্তাবনার শেষাংশে 'আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি' - এর অর্থ হল ভারতের জনগণই সংবিধানের স্রষ্টা এবং তাদের ইচ্ছাই হল সংবিধানের উৎস। ভারতীয় জনগণই হল সংংবিধানের উৎস ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

২.৩ প্রস্তাবনার তাৎপর্য্য

প্রস্তাবনায় উল্লিখিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের যথাযথ বিশ্লেষন করলেই প্রস্তাবনার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অধ্যাপক সুভাষ সি কাশ্যপের (Subhas C. Kashyap) মতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষন করলে নিম্নলিখিত সাংবিধানিক মূল্যবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন সার্বভৌমত্ব, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যাক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি।

২.৩.১ সার্বভৌমত্ব (SOVEREIGNTY)

রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন উপাদান হল সার্বভৌমত্ব, এর অর্থ হল চরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। অস্টিন (Austin) বলেন, "যদি কোন সমাজে কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যাক্তি বা ব্যাক্তি সংসদ অন্য কোনো উচ্চতর কতৃপক্ষ এর বশ্যতা বা আনুগত্য স্বীকার না করে সমাজের অধিকাংশ লোকের স্বাভাবিক আনুগত্য লাভ করে, তবে ঐ নির্দিষ্ট ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিসংসদ সার্বভৌম এবং উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে নিয়ে গড়ে ওঠা সমাজ হল রাজনৈতিক ও স্বাধীন।" আভ্যন্তরীন সার্বভৌমতার অর্থ হল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হল চূড়ান্ত ও অপরিহার্য। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে পরিচালিত না হওয়ার ক্ষমতা।

টিপ্পনী

অর্থাৎ সার্বভৌমিকতার প্রকাশ আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই প্রয়োজ্য।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ভারতকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় । কারণ ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় আইন চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহতভাবে কার্যকর। ভারতের প্রতিটি ব্যাক্তি বা সংস্থা ভারতের আইন মেনে চলতে বাধ্য। একই রকম ভাবে বৈদেশিক ক্ষেত্রেও ভারত অন্য বিদেশী রাষ্ট্রে দ্বারা পরিচালিত নয়। ভারত অরুণাচল প্রদেশ সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা চীন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থির করে দিতে পারে না।

২.৩.২ সমাজতন্ত্র (SOCIALISM)

ভারতের মূল সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি যুক্ত ছিল না ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শব্দটি যুক্ত হয়। অধ্যাপক সুভাষ সি. কাশ্যপ বলেন, "ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা ভারতে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার বা মর্যাদা ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার কথা বললেও কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা অর্থনৈতিক মতবাদের প্রতি প্রবণতা প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না।" যাইহোক, ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সাধারনভাবে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় ব্যাক্তিগত মালিকানার অবসান ও সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্টা । মরিস কনফোর্থ বলেছেন, "Socialism is the social ownership of the means of production and their utilization to satisfy the material and cultural requirements of the whole society." স্তালিন সমাজতন্ত্র বলতে বলেন, "He who does not work, neither shall he eat."

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়। সেই সময় তিনি বলেন 'আমাদের নিজেদের ধরনের সমাজতন্ত্র' ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রথাগত সমাজতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে না ; কারণ ভারতে সমস্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের জাতীয়করণ বা ব্যাক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি ঘটবে না। তবে যে সব ক্ষেত্রে জাতিয়করণ প্রয়োজন বলে মনে করা হবে, শুধুমাত্র সেগুলির জাতিয়করণ হবে । তবে বর্তমান ভারতে সমাজতন্ত্র দূরের কথা, তার কোনো বৈশিষ্ট্য আর নেই। ভারতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে অব্যাহত রয়েছে।

২.৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা (SECULAR)

ভারতীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্রের মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ধর্ম বিরোধী বা ধর্মহীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। এর অর্থ হল এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা বিশেষ কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধীতা করে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকে। ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশী বসবাস করে আসছেন। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন হলেও ভারত কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মতো রাষ্টের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেনি।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সমস্যার মুখোমুখি হয়। ১৯৯২ সালের ৬ডিসেম্বর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কলুষিত করেছে। আবার ২০০২ সলে আমেদাবাদে মোদী সরকারের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করার ব্যর্থতা মানুষকে হতচকিত করে তোলে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তবে ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে সব সময় তৎপর রয়েছে।

২.৩.৪ গণতন্ত্র (DEMOCRACY)

ভারতকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে কী ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা নেই।

সংবিধান প্রণেতারা ভারতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সমাজিক গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে আগ্রহী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু বলেছেন "ভারতে স্বাধীনতার সাথে সাথে নিরন্ন জনগণের মুখে অন্ন তুলে দেবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে" বস্তুত ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে ভোটাধিকার স্বীকৃত। ৫বছর অন্তর জনগণ সরকার গঠন করে। ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১৭ বার সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগণ এই নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু বহু সমালোচক প্রস্তাবনায় গণতন্ত্র শব্দটি শুধু বাগাড়ম্বর বলে উল্লেখ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করেন। তাদের মতে ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি।২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মাত্র ৬৫.৩৮ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর। অথচ জে. এস. মিল সার্বজনীন শিক্ষাকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বশর্ত বলে মনে করেন। এটা অনস্বীকার্য যে ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করতে হলে সার্বজনীন শিক্ষা জরুরি। তথাপি বর্তমান ভারত 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের' দেশ বলে স্বীকৃতি লাভ করে থাকে।

২.৩.৫ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (REPUBLIC)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুভাষ সি কাশ্যপ (Subhash C. Kashyap) বলেন 'প্রজাতন্ত্র' হল এক প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে জনগণ চরম ক্ষমতার অধিকারী, কোনো প্রকারের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেনী অনুপস্থিত এবং সমস্ত সরকারি পদ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এই ব্যবস্থায় কোনো বংশানুক্রমিক শাসক থাকেন না এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন। ম্যাডিসন বলেন, "Republic is a government which derives its power directly or indirectly from the great body of the people, and is administrated by porosus holding their offices during pleasure, for a limited period, or during good behavior."

ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র কারণ এখানে শাসক জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি বংশানুক্রমিক শাসক নন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। শাসক সংবিধান বিরোধী কাজ করলে ইম্পিচমেন্ট অর্থাৎ পদচ্যুতির সম্মুখীন হবেন। এই সব প্রজাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ভারতে বিদ্যমান থাকলেও কিছু কিছু তাত্ত্বিক কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের প্রজাতান্ত্রিক চরিত্রের পরিপন্থী বলে মনে করেন। কমনওয়েলথের সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক হওয়ায় এই অভিযোগ অমূলক। সুতরাং ভারত ও স্বেচ্ছায় যে কোনো দিন কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগ করতে সক্ষম।

২.৩.৬ ন্যায়বিচার (JUSTICE)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচারের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ন্যায়বিচারে অর্থ হল ব্যাক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থ এবং ব্যাক্তি শ্রেনীর স্বার্থের মধ্যে এবং

অন্যান্য লোকসমাজের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। ভারতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের থেকে ও ন্যায়বিচারকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, ভারতে ন্যায়বিচার শুধুমাত্র আদালতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বিস্তৃতি সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

টিপ্পনী

সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বশেষে সকল নাগরিককে সমান বলে গণ্য করা বোঝায়। ভারতের সংবিধানের ১৫ নং ধারায় সরকারি স্থানসমূহে সকলের প্রবেশাধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একইরকম ভাবে ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি তা পালন আইনযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। জওহরলাল নেহরু বলেন, "Soial justice has always exercised on appeal to sensitive purposes. The basic attraction of Materialism for millions of people was not, I think, its attempt at Scientific theory but its o passion for social justice." কাজের ক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশ, মাতৃত্বকালীন সুযোগ, অবসর বিনোদন, অনুন্নত শ্রেনীর অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার, ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি। সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে অভিমুখকে প্রসারিত করে আবার সংবিধানের ৩৯ নং ধারাব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে-

(i) প্রতিটি নাগরিক যাতে পর্যাপ্ত জীবনধারনের সুযোগ পায়।

(ii) সম্পদের মালিকানা এমনভাবে নিয়ন্ত্রন করা হবে যাতে বেশি সংখ্যক জনগণের কল্যাণ সাধন হয়।

(iii) নারী ও পুরুষ যাতে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায়।

(iv) সমাজের শিশু ও যুব সম্প্রদায় যাতে শোষনমুক্ত সমাজে মর্যাদা সহ বসবাস করতে পারে।

সংবিধানের ৩৬ - ৫১ নং ধারায় নানাভাবে অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। ১৬ নম্বর ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ন, বংশ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ৩২৫ ও ৩২৬ নম্বর ধারা অনুসারে সকল

প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়।

টিপ্পনী

তবে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলায় প্রকৃত ন্যায়বিচার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। "একজন ব্যাক্তির জন্য এক ভোট, নীতি কার্যকর হলেও অশিক্ষা, অসাম্য, দারিদ্র মানুষের ভোটকে মূল্যহীন করে তুলেছে।

২.৩.৭ স্বাধীনতা (LIBERTY)

'স্বাধীনতা' ধারনাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকে যার আক্ষরিক অর্থ হল দাসত্ব থেকে মুক্তি। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতাকে ইতিবাচক দিক থেকে যুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে - চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম, উপাসনার স্বাধীনতা ভারতীয় নাগরিকরা ভোগ করবে। মৌলিক অধিকারের নানা ধারায় ব্যাক্তি ও রাষ্ট্রের বিকাশে স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ সংবিধান এর ১৯ নম্বং ধারায় ৬ টি স্বাধীনতার মধ্যে বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে এবং ২৫ -২৮ নম্বর ধারায় ধর্মাচরণের স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইতিবাচক কারণ ব্যাক্তি তার পচ্ছন্দমতো ধর্মাচারণ করতে পারে। তবে স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি করার অধিকার নয় ; স্বাধীনতা ততটাই গ্রহণীয় যতক্ষন না তা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। এই কারনে জনস্বার্থের স্বাধীনতাকে যুক্তিসিদ্ধ সীমাবদ্ধতা বা Reasonable restriction এর আওতায় আনা হয়েছে।

২.৩.৮. সাম্য (EQUALITY)

সাধারনভাবে সাম্য বলতে বোঝায় যে সকল মানুষই আইনের চোখে সমান। রাষ্ট্র কাউকে রক্ষা করা বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য করবে না। প্রতিটি নাগরিক জন্মসূত্রে সকল সরকারি দপ্তরে, সম্মানে ও অবস্থানে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ পাবে। তবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার শুধুমাত্র মর্যাদা ও সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। তবে এর আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক আছে। প্রতিটি নাগরিক আইনের চোখে সমান ও দেশের আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে

সকলেই যে কোনো সার্বজনীন স্থানে প্রবেশের অধিকার এবং সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে থাকে।

তবে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যপক ভাবে বিরাজ করায় অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্য প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। সম্পদশালী গোষ্ঠী বা মানুষ আজও মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা লাভ করে থাকে।

টিপ্পনী

২.৩.৯ ভ্রাতৃত্ববোধ (FRATERNITY)

সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ভারতীয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধকে প্রসারিত করে। তাই ভারতে নানা ভাষা, নানা মত, নানা জাতি, নানা সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করলেও তারা সবাই ভারতমাতার সন্তান বলে মনে করেন। মৌলিক অধিকারসমূহ নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যের ভাবনাকে প্রতিহত করে এবং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভ্রাতৃত্ব বোধকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী । ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে মৌলিক কর্তব্যের ((৫১ক) সংযোজন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর বলেচিলেন - "Fraternity Indians being one common brotherhood of all Indians - of unity and solidarity to social life." তবে ভারতে নির্বাচনী রাজনীতির কারনে ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

২.৩.১০ ব্যাক্তির মর্যাদা (DIGNITY OF INDIVIDUAL)

ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদিকে মৌলিক অধিকারের দ্বারা সুরক্ষিত করে জীবনের মানকে উন্নত করা এবং রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির দ্বারা জীবনযাত্রার উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতার অবলুপ্তির মাধ্যমে ব্যাক্তির মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ব্যাক্তি তার অধিকার তথা মর্যাদাকে সুরক্ষিত করার জন্য সুপ্রীমকোর্টের কাছে সরাসরি আবেদন করতে পারে। এই সব কারণে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ব্যাক্তির মর্যাদাকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

টিপ্পনী

২.৩.১১ জাতির ঐক্য ও সংহতি (UNITY AND INTEGRITY OF THE NATION)

ব্যাক্তির অধিকার ও মর্যাদাকে সুরক্ষিত করার জন্য জাতির ঐক্য ও সংহতি জরুরি। ভ্রাতৃত্ববোধের বিস্তারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব নয়। সংবিধানের ৫১ (ক) ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি নাগরিককের কর্তব্য হল দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সর্বোপরি জাতিগত সন্ত্রাস ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পথে বাঁধা স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, প্রস্তাবনার বিশ্লেষনের মাধ্যমে সম্পূর্ন সংবিধান সম্পর্কে পাঠকের সামগ্রীক ধারনা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের আত্মার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কার্যত প্রস্তাবনার মাধ্যমেই সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। অস্টিন (Austin) বলেন প্রস্তাবনার মাধ্যমে ভারতের পুনর্জন্ম সুনিশ্চিত হয়েছে। "The preamble is the most precious part of the constitution . It is te soul of the constitution. It is key to the constitution."

২.৪ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(ক) 'ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র' - ব্যাখ্যা কর।

(খ) 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে কী বোঝ?

(গ) 'গণতন্ত্র' ও 'প্রজাতন্ত্রের' মধ্যে পার্থক্য নিরূপন কর।

(ঘ) 'জাতির ঐক্য ও সংহতি' বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) 'সাম্য' ও 'স্বাধীনতার পার্থক্য কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(ক) ভারতIয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সংযুক্ত করার কারণ কী ছিল?

(খ) ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য আলোচনা কর?

২.৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(ক) M.V. Pylee, "India's Constitution", S. Chand and Co. New Delhi, 2001

(খ) J.C. Johari, "Indian Constitution and Politics", Vishal Publications, Jalandhar, 2001.

(গ) Bidyut Chakraborty and Rajendra Kumar Pandey, "Indian Goverment and Politics", Sage Publications, New Delhiu, 2008.

(ঘ) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্রম্ কলকাতা, ২০১০.

(ঙ) কল্যানকুইমার সরকার, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" শ্রীভুমি, কলকাতা, ২০১০.

(চ) প্রাণগোবিন্দ দাশ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" সেন্ট্রাল, কলকাতা, ২০১১.

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারও কর্তব্যসমূহ

টিপ্পনী

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার ও তার বৈশিষ্ট্য

৩.২.১ - সাম্যের অধিকার

৩.২.২ - স্বাধীনতার অধিকার

৩.২.৩ - শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার

৩.২.৪ - ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

৩.২.৫ - সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার

৩.২.৬ - সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

৩.৩ - ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

৩.৪ - অনুশীলনী

৩.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভূমিকা

ভারত ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত পরাধীন ছিল। আর পরাধীন ভারতে নাগরিকদের অধিকারের চিন্তা ছিল কষ্টকল্পিত । তবে ১৮৯৫ সলের ভারতীয় সংবিধান বিল (The Constitution of India Bill, 1895) পাশের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা, স্বাধীন শিক্ষা ও ব্যাক্তি স্বাধীনতার মত কিছু অধিকার সীমাবদ্ধ ভাবে ভোগের অধিকার সংক্রান্ত দাবি গুরুত্ব পেতে থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালের নতুন সংবিধানে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু অধিকার লিপিবদ্ধ হয়। ভারতের সংবিধানে প্রধানত তিন ধরনের অধিকার দেখা যায় - মৌলিক অধিকার (১২ - ৩৫ নম্বর ধারা), নির্দেশমূলক বা নীতি সমূহ (৩৬ -৫১নম্বর ধারা) এবং বিধিবদ্ধ অধিকার (৩০০ ক নম্বর ধারা)।

তবে সাধারণভাবে যে সকল অধিকার মানুষের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে একান্ত

টিপ্পনী

অপরিহার্য তাকেই মৌলিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক দূর্গাদাস বসুর ভাষায় "A fundamental right is one which is protected and granted by the written constitution of the state." অর্থাৎ মৌলিক অধিকার হল সেই সমস্ত অধিকার যা দেশের লিখিত সংবিধান দ্বারা রক্ষিত ও সুনিশ্চিত। ভারতে অবশ্য মৌলিক অধিকার ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। কারণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা একান্ত প্রয়োজনীয়, তার সবগুলি স্বীকার করা হয় নি। যেমন - কর্মের অধিকার ভারতে মৌলিক অধিকার নয়। একই রকমভাবে সম্পত্তির অধিকার ও বিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এক কথায় বলা যায় মৌলিক অধিকারগুলি দেশের সর্ব্বোচ্চ আইন, শাসন আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক এই আইনগুলি বাতিল করা যায় না। আবার সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে এই অধিকার গুলিতে বাতিল করা যায় না এগুলি শুধুমাত্র সংবিধান বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায়।

৩.২ ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার ও তার বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫নম্বর ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ লিপিবদ্ধ আছে। মূল সংবিধানে ৭টি অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হলেও ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর ১৯৭৮ সাল থেকে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের আওতায় পড়ে না। বর্তমানে যে মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত তা হল -

(১) সাম্যের অধিকার

(২) স্বাধীনতার অধিকার

(৩) শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার

(৪) ধর্মাচরণের অধিকার।

(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার।

(৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ এই ৬টি মৌলিক অধিকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

গুলি হল -

(১) অধিকারগুলি মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ অধিকারগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের। অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারনে অনেকে ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সমূহকে খন্ডিত ও সীমাবদ্ধ বলে থাকেন।

টিপ্পনী

(২) আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য। নাগরিক অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সংবিধানের ৩২ নম্বর ও ২২৬ নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট লেখ (Writ) জারি করে মৌলিক অধিকার বলবৎ করে এবং শাসন ও আইন বিভাগের স্বেচ্ছাচার থেকে নাগরিকদের রক্ষা করে থাকে।

(৩) যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ

সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের প্রতিটির সঙ্গে 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' (Reasonable Restriction) আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শৃঙ্খলা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ইত্যাদি কারনে বাক্ স্বাধীনতার অধিকার তথা অন্যান্য মৌলিক অধিকারের 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' আরোপ করা যায়।

(৪) জরুরি অবস্থায় কার্যকর নয়

দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে মৌলিক অধিকার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ৩৫৯ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্টপতি মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতাকে বাতিল করতে পারেন। ভারত - পাকিস্তান বা ভারত - চীন যুদ্ধের সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয়েছিল।

(৫) অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন - তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আইনসভা নির্বাচন,

টিপ্পনী

উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে নিওগের ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত।

(৬) বাস্তব সম্মত নয়

সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ অধিকার ঘোষনাই যথেষ্ট নয় ; সেই ঘোষনা কার্যকর করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা না থাকলে তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারতের মৌলিক অধিকার গুলি ও এর ব্যাতিক্রম নয়।

(৭) নিবর্তনমূলক আটক আইন

ভারতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে মৌলিক অধিকার গুলিকে সংকুচিত বা সীমাবদ্ধ করতে পারে। সংবিধান গ্রহণের পর থেকেই নির্বতনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act), ভারতরক্ষা আইন, আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা রক্ষা আইন, জাতীব নিরাপত্তা আইন, টাডা এবং সাম্প্রতিক POTA (prevention of organsed Terrorist Act) প্রভৃতির কারণে বিভিন্ন সময়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংকুচিত হয়েছে।

(৮) মৌলিক কর্তব্য

ভারতের সংবিধান প্রথমে শুধুমাত্র অধিকারগুলি উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্যহীন অধিকার মূল্যহীন, তাই ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যগুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

(৯) ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার নয়

ভারতের সংবিধানে ভোটাধিকার রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিধিবদ্ধ হলেও মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারা অনুসারে ভোটাধিকার বিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে।

(১০) সমন্বয়ী রূপ

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার গুলি বিভিন্ন দেশের সংবিধান

থেকে অনুসৃত। যেমন - মানবাধিকার সংক্রান্ত ফরাসি ঘোষনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Bill of Rights' ডাইসির 'Rule of Law আয়ারল্যান্ডের ও জাপানের মৌলিক অধিকার সমূহের গভীর প্রভাব ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারে দেখা যায়। আবার উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শ, গান্ধীবাদী ও মার্কসীয় মতাদর্শের সমন্বয়ী রূপ মৌলিক অধিকারে দেখা যায়।

টিপ্পনী

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি অসম্পূর্ণ, সংশোধনযোগ্য এবং সীমিত হওয়ায় তার প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। যাইহোক ভারতের সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলির প্রকৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

৩.২.১. সাম্যের অধিকার

বৈষম্যের অবসানই হল গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষনা পত্রে বলা হয়েছিল, "All men are equal" যা বৈষম্যের অবসানকে নির্দেশ করে এই আদর্শের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব, যার মূল দাবি ছিল "Liberty, Equality, Fraternity' অর্থাৎ স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার প্রথম ও প্রধান মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষিত।

(ক) আইনের চোখে সমান ও সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার (১৪নং ধারা)

সংবিধানের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে "ভারতের ভূখন্ডে প্রত্যেক ব্যাক্তি আইনের চোখে সমান (Equality before the law) এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার (Equal protection of law) থেকে বঞ্চিত হবে না" অর্থাৎ কোনো বাক্তি যতই মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন আইনের দৃষ্টিতে তার কোনো বিশেষ স্থান নেই। সমান অপরাধ করলে সমান শাস্তি ভোগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ ব্যাক্তি সকলেইও আইনের দৃষ্টিতে সমান। এই অংশটি ব্রিটেনের 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) তত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আইনের দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হবার অধিকার ধারনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি (Due process of law) তত্ত্বের অনুসরনে ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ হল একইরকম পরিস্থিতিতে আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে

টিপ্পনী

প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু বাস্তবে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান নয় ভারতীয় সংবিধানে এই নীতির কতগুলি ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করে যায় যেমন - রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল স্বপদে থাকাকালিন তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আদালতের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। এমনকি স্বপদে থাকাকালিন এঁদের গ্রপ্তার করা যায় না, দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে হলেও ২মাস আগে নোটিশ দিতে হয়। সাংসদ ও বিধায়করা ভারতীয় সংবিধান অনুসারে বিশেষাধিকার ভোগ করায় তাঁদের ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযুক্ত হয় না।

(খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ সমানধিকার (১৫নম্বর ধারা)

সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষ সকল নাগরিকদের দোকান, রেস্তোরা,হোটেল এবং প্রমোদ স্থানে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এমন কি রাষ্ট্রের সম্পূর্ন বা আংশিক অর্থ সাহায্য পরিচালিত কুয়ো, স্নানের ঘাট বা রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এই অধিকারের ও দুটি ব্যাতিক্রম আছে। যেমন -

(১) নারী ও শিশুদের জন্য রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করলে তা বৈষম্যমূলক আচরন বলে বিবেচিত হবে না।

(২) শিক্ষা ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেনীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন ও বৈষম্য বলে বিবেচ্য হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমাজে ও শিক্ষার অনগ্রসর শ্রেনীর নাগরিকগণের উন্নতির জন্য তপশিলি জাতি, এবং উপজাতিদের জন্য রাজ্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করলে তা সাম্যের লঙ্ঘন বলে বিবেচ্য হবে না।

(গ) চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার (১৬নং ধারা)

সংবিধানের ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমানাধিকার বজায় থাকবে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জন্মস্থান

স্ত্রী-পুরুষ বা বাসস্থানের কোনো একটির কারণে চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করবে না। সরকারি চাকরি বা নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রেও সরকার কোনো বৈষম্য করবে না।

তবে এই অধিকারে ক্ষেত্রেও ব্যাতিক্রমের উল্লেখ আছে। যেমন-

(১) সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষ চাকরির ক্ষেত্রে সেই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসের শর্ত আরোপ করতে পারে।

(২) অনগ্রসর ও অনুন্নত শ্রেনীর নাগরিকদের জন্য রাজ্য কিছু চাকরি সংরক্ষণ করতে পারে।

(৩) আবার ১৬ (৫) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যাক্তিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা সাম্যের অধিকারের পরিপন্থী হবে না।

(ঘ) অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন (১৭নং ধারা)

সংবিধানের ১৭ম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতাকে আইনত দন্ডনীয় বলে ঘোষনা করা হয়েছে। তবে অস্পৃশ্যতা প্রয়োগ করতে চাইলে ব্যাক্তির কী শাস্তি হবে তা ১৯৫৫ সালে রচিত 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইনে' বলা হয়েছে । এই আইনে বলা হয়েছে 'অস্পৃশ্যতা' বলে কোনো ব্যাক্তির হাসপাতালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো মন্দির, দোকান, হোটেল বা প্রমোদস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এমনকি সকলের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, কুয়ো, টিউবওয়েল, জলাধার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'অস্পৃশ্য' বলে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন (Untouehability offence Act 1955) পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়ে পৌর অধিকার সংরক্ষণ আইন (Protection of Civil Rights Act) নামে লিপিবদ্ধ হয়।

(ঙ) উপাধিদান নিষিদ্ধ (১৮নং ধারা)

সংবিধানের ১৮নং ধারায় বলা হয়েছে সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোনো উপাধি দিতে পারবে না এবং কোনো ভারতীয় নাগরিক কোনো বিদেশী উপাধিও গ্রহন করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে সরকার সেই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লঙ্ঘন করে ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী ইত্যাদি উপাধি ক্রমাগত দান করে চলেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জনতা সরকার এই সমস্ত উপাধি বা খেতাব দান বন্ধ রাখে। কিন্তু পরবর্তী সরকার এই উপাধিদান চালু রেখেছে। সংবিধানে উপাধিদানের বা খেতাব প্রদানের যে ব্যবস্থা চালু তা সাম্য নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। বহু সমালোচক মনে করেন এ ধরনের উপাধি দান সাম্যনীতির পরিপন্থী।কারন -

(১) যাঁরা এই উপাধি লাভ করেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অন্যান্য নাগরিকদের থেকে বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।

(২) নিজেদের নামের সাথে সেই খেতাব ব্যবহার করা যাবে না বলা হলেও বহুক্ষেত্রে তা ব্যবহার হয় এবং এই ব্যবহার অপরাধ বলে কোথাও ঘোষিত হয় নি।

(৩) বহুক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী নিজ গোষ্ঠীর লোককে খেতাব দিতে দেখা যায়। আবার অনেকে এই খেতাব দানকে সাম্য নীতির পরিপন্থী মনে করেন।

সাম্যের আদর্শ বহু প্রাচীন ও বহু প্রত্যাশিত। কিন্তু একে বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। বস্তুতঃ অর্থিক বৈষম্য ভারতে সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তবে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য এলেই যে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে তাও নয়, সাম্য তখনই সম্ভব যখন মানুষ সাম্যের আদর্শ দ্বারা চালিত হবে।

৩.২.২ স্বাধীনতার অধিকার

সাম্যের মত স্বাধিনতা ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ। প্রতিটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বাধীনতার অধিকারকে অন্যান্য অধিকারের প্রানকেন্দ্র বলে চিহ্নিত করা হয়। স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের মূল শর্ত ভারতীয় সংবিধানে ১৯ থেকে ২১ নম্বর ধারায় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ২২ নম্বর ধারায় কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অধিকারগুলি ভারতে কতটা কার্যকর তা বিচার করা আবশ্যক।

(ক) 'ছ' প্রকারের স্বাধীনতার অধিকার (১৯নং ধারা)

ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত ছ'টি অধিকারকে স্বাধীনতার

অধিকারের মূল ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। মুল সংবিধানে ১৯ নম্বর ধারায় সাত প্রকারের স্বাধীনতার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সম্পত্তির অধিকার কে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে ছয় প্রকারের স্বাধীনতা ১৯ নং ধারা স্বীকৃত তা হল-

(১) বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।

(২) শান্তিপূর্ন ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকার।

(৩) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার।

(৪) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার।

(৫) ভারতের যে কোন অংশে বসবস ও স্থায়িভাবে থাকার অধিকার।

(৬) যে কোন বৃত্তি, পেশা গ্রহন বা ব্যবসা চালানোর অধিকার ।

প্রসঙ্গত উল্ললেখ যে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা ১৯(১) (চ) ধারাকে বাদ দেওয়া হয় তা নয় ; তাছাড়া ও ৩১ নং ধারায় সম্পূর্ন অবলুপ্তি ঘটে। তবে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে না থাকলে ও আজ এই অধিকারটি বিধিবদ্ধ অধিকার (Statutory right) হিসেবে ৩০০ (ক) ধারায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(১) বাক্স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার

ভারতের সংবিধানে ১৯ (১) ধারায় শুধু বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সরাসরি স্বীকার করা হয় নি। তবুও সংবাদপত্রগুলি এই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। তবে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করেননি। ১৯৫০ সালে রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় বিচারপতি পতঞ্জল শাস্ত্রী বলেন বাক্ স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অঙ্গীভূত। ১৯(১) ধারায় বাক্ স্বাধীনতার সঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যুক্ত হওয়ায় এ অধিকার যে ব্যপকতা লাভ করেছে তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। বস্তুত বাক্স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভারতে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদঢ় করেছে। কিন্তু ১৯(১) (ক) ধারায় এই অধিকারের উপর রাষ্ট্র কয়েকটি কারনে 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' আরোপ করতে পারে, যেমন - রাষ্ট্রের নিরাপত্তা,

টিপ্পনী

বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক রক্ষা, জনশৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা, আদালতের অবমাননা, মানহানি, অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা, ভারতের সার্বভোমত্ব ও সংহতি ইত্যাদি।

টিপ্পনী

(২) সমবেত হওয়ার অধিকার

শান্তিপূর্ন ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। জনমত গঠনের অন্যতম বাহন হিসেবে সমবেতে হওয়ার অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক M.V. Paylee বলেন "Infact freedom of osscutty and freedom of speech go hand in hand" সভা, শোভাযাত্রা বা মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক জনমত বিকশিত হতে দেখা যায় ভারতে এই অধিকার ও নানা কারনে যুক্তি সংগত বাধানিষেধের আত্ততায় আসতে পারে। যেমন - শান্তিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা ও ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে রাষ্ট্র যে কোন সমাবেশের ওপর 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' আরোপ করতে পারে।

(৩) সমিতি গঠনের অধিকার

সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার শ্রমজীবি ও সাধারণ মানুষের এক গুরুত্বপূর্ন অধিকার। এই অধিকার বলে সাধারণ মানুস ও শ্রমজিবী শ্রেনী সংঘ বা সমিতি গড়ে তুলতে পারে। তবে এই অধিকার ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। সার্বভৌমত্ব, সংহতি, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার কারণে এই অধিকারের ওপর ও 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' আরোপ করা যায়।

তবে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সংগঠন সমূহকে তথা সমিতি ও সংঘ গঠনের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকবে এবং সংসদের এরকম আইনে সাম্যের অধিকার ক্ষুন্ন হলেও বাতিল হবে না। তবে ৪৩ তম সংবিধান সংশোধন করে সংসদের এই সমতাকে রদ করা হয়।

(৪ ও ৫) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার এবং যেকোনো অংশে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের অধিকার

ভারতের যে কোন অংশে নাগরিক স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে। এই দুটি অধিকারই একে অন্যের সাথে সংযুক্ত এবং অধিকারের মাধ্যমেই

ভারতের ভূখন্ডের অভিন্নতাকে স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত ভারতের যে কোনো নাগরিক যে কোনো অঞ্চলে যেতে পারে এবং বসবাস করতে পারে। তবে জনস্বার্থে বা তপশিলি জাতি বা উপজাতিদের স্বার্থে রাষ্ট্র এই দুই অধিকারের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত বাধানিষেধের সীমাবদ্ধতা প্রসারিত করতে পারে। যেমন ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার বনাম কৌশলা মামলার রায়ে পতিতাদের বিশেষ এলাকা হতে অন্য এলাকায় বসবাস ও ব্যবসা নিষিদ্ধ করে।

টিপ্পনী

(৬) যে কোন বৃত্তি অবলম্বন বা যে কোন পেশা, ব্যবসা বা বণিজ্য চালানোর অধিকার

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে যে কোনো বৃত্তি, পেশা, ব্যবসা - বানিজ্য অংশগ্রহন করতে পারে। তবে জনস্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। যেমন - কোনো ব্যাক্তি ক্ষতিকারক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না অথবা ড্রাগ ও মদের ব্যবসা ইচ্ছেমতো করতে পারে না আবার ভেজাল ব্যবসা বা নারীদের নিয়ে ব্যবসা করতে পারে না।

সুতরাং ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। সরকার সংবিধান বর্ণিত পথে ঐ অধিকারের ওপর নানা বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে । এই বিধি নিষেধ গুলিকে 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' (Reasonable estriction) বলে অভিহিত করা হয়েছে । তবে সরকার কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধ যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের ওপর বার্তায় । কিন্তু আদালত নিজে উদ্যোগী হয়ে বাধানিষেধের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। শুধু যোক্তিকতা সম্পর্কে কোনো পথ আদালতে কেউ উত্থাপন করলেই তবেই তা বিচার করতে পারে।

শাস্তিদানের যথেচ্ছ ক্ষমতা রদ (২০নম্বর ধারা)

সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় শাস্তিদানের যথেচ্ছ ক্ষমতাকে রদ করা হয়েছে। এই ধারানুসারে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তিনটি নীতি মেনে চলার কথা বলা হয়েছে, যেমন -

(ক) রাষ্ট্র কোনো আইন প্রণয়ন করে পূর্ববর্তী কোনো অপরাধের জন্য শাস্তির

টিপ্পনী

পরিমাণ বাড়ানো পরবর্তী সময়ে অপরাধ বলে গণণ্য করে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

(খ) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যাক্তিকে দুবার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

(গ) কোনো ব্যাক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্যকরা যাবে না।

সুতরাং ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোনো ব্যাক্তিকে দন্ড দেওয়া যাবে তৎকালিন আইনের নিরিখে। অর্থাৎ যে সময়ে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেই সময়ের আইন অনুযায়ী অভিযুক্তের দন্ড দেওয়া যায়। আবার কোনো আইন প্রণয়ন করে পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধের শাস্তি দেওয়া যাবে না।

জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা (২১ নং ধারা)

সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে আইনসঙ্গত পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যাক্তিকে তার জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ভারতের এই আইনসঙ্গত পদ্ধতি আমেরিকা যুক্তাষ্ট্রের 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির (Due Proses of Law) মত নয়। জাতীয় জরুরি অস্থা চলাকালিন সময়েও এই অধিকার বাতিল হয় না। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা চলাকালিন সময়ে জীবন ও ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা যাবে না।

অবৈধ আটক ও গ্রেপ্তারে বিরুদ্ধে অধিকার (২২ নং ধারা)

সংবিধানের ২২ নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে অবৈধ আটক ও গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার। এই ধারা অনুসারে কোনো ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে। আটক ব্যাক্তিকে তার পচ্ছন্দমতো আইনজিবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দিতে হবে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে। কোনো ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। এই অধিকারের ব্যাতিক্রম আছে। যেমন - বিদেশি শত্রুভাবাপন্ন দেশের নাগরিক হলে তার ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযুক্ত হবে না। আবার নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention Act) আটক ব্যাক্তির পক্ষে

ও এই আইন বলবৎ হবে না।

নিবর্তনমুলক আটক আইন

নিবর্তনমূলক আটক আইন হল যদি কোনো ব্যাক্তি অপরাধমূলক কাজ থাকে বা ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এই আশঙ্কায় সরকার সেই ব্যাক্তিকে বিনা বিচারে আটক করতে পারে এবং এই ধরনের আটকের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে কারণ দর্শাতে হয় না বা আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে হয় না। অর্থাৎ কোনো ব্যাক্তি অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত আছে বা অপরাধ করতে পারে এই সন্দেহে বা ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কাজ করতে পারে এই সন্দেহে বা ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কাজ হতে বিরত করার জন্য সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার বা আটককে 'নিবর্তনমুলক আটক আইন' বলা হয়। সন্দেহের কারণে ১৯৬২ সালে পশ্চিম প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

দেশের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ইত্যাদি কারণে সংসদ এবং রাজ্য আইন সভাগুলি নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রবর্তন করতে পারে। যেমন ১৯৭১ সালে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা আইন Maintence of Internal Security Act (Misa), ১৯৭৪ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন বা COFEPOSA, জাতীয় নিরাপত্তা আইন বা National Sact,1980 (NSA) এবং বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ দমনমূলক আইন বা Prevention of Drganised Terrorist Act, 2002 (POTA) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.২.৩ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

শোষন গণতন্ত্রের পথে অণ্যতম প্রধান অন্তরায়।কারন শোষণ বজায় থাকলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।এই কারনে সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের ২৩ নম্বর ধারা অনুসারে মানুষকে নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ ক্রয় - বিক্রয় খাটানো বা বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এই শোষণ ব্যবস্থা অপরাধ এবং আইনত দন্ডনীয় বলে ঘোষিত হবেছে। মানুষের ক্রয় বিক্রয় বলতে নীতি বহির্ভূত ভাবে বা অন্য উদ্দেশ্যে নারী, শিশু ইত্যাদির

টিপ্পনী

ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পতিতাবৃত্তি এবং শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করাকে এই আইন নিষিদ্ধ করতে চেয়েছে। তবে ব্যাতিক্রম হিসেবে বলা যায়, রাষ্ট্র জনস্বার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে। যেমন ১৯৬৩ সালে চিন - ভারত যুদ্ধের সময় NCC তে কলেজ ছাত্রদের যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল।

টিপ্পনী

সংবিধানের ২৪ নম্বর ধারা অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ। এই ধারাকে ভিত্তি করে The Mines Act (1952), The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তবে আজও হোটেল, রেস্তোরাঁ বা রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে হিসাবে বহু শিশু শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়।

৩.২.৪ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বহু ধর্মের মানুষ বসবাস করে আসছে। ব্রিটিশ শাসনকালে এই ভারতে ব্রিটিশদের প্ররোচনায় ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও প্রসার হয়। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যকে প্রসারিত করেন এবং রচনা করেন - "ঈশ্বর, আল্লাহ তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান।" সংবিধান প্রণেতারা এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও সংবিধানের কোনো ধারায় 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত করেনি। তবে ১৯৭৬ সলে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত থাকে না। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্ রঅর্থিক আনুকুল্য প্রদর্শন বা প্রশাসনিক পৃষ্ঠ পোষকতা প্রদর্শন করে না। তবে কোন রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বিবেচিত হতে হলে প্রত্যেক ব্যাক্তিকে বিশ্বাস ও পচ্ছন্দ অনুযায়ী তার নিজস্ব ধর্মমত পোষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরন করতে পারে না। এই কারণে সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ধর্মাচরনের স্বাধীনতা

সংবিধানের ২৫ নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক ব্যাক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কোনো ধর্মমত গ্রহন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং ধর্মমত প্রচার করতে পারে।

সাধারণভাবে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না তবে জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র ধর্মাচরনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। নরবলি, সতীদাহ ও দেবদাসী প্রথার মত অমানবিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

টিপ্পনী

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার (২৬নং ধারা)

সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোনো অংশ ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষন করতে পারবে; ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, দখল এবং আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারনে এই ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতিতে কর প্রদানে বাধ্য না করা (২৭নং ধারা)

সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারানুসারে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যায় না। তবে মন্দির দর্শন, পূজার্চনা প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র কর র্ত্য করার পরিবর্তে ফি ধার্য করে সংবিধানের এই বাধাটি অতিক্রম করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা (২৮নং ধারা)

সংবিধানের ২৮ নং ধারা অনুসারে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান করা যাবে না। আবার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুমতি ছাড়া ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবে না। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রয়োজন।

ভারতে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মত ভারত ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। ভারতে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। তবে সমাজের সকল স্তরের সহযোগিতার ভিত্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত হবে।

টিপ্পনী

৩.২.৫ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার

ব্যাক্তির পরিপূর্ন বিকাশের জন্য অন্যান্য মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারে অপরিহার্য। যে কোন উন্নত দেশের উন্নতির মাপকাঠি হল শিক্ষা। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছেন। তাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের মূল্ লক্ষ্যই হল সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সুনিশ্চিত করা।

সংস্কৃতির সংরক্ষণ (২৯নং ধারা)

সংবিধানের ২৯নম্বর ধারানুসারে ভারতীয় ভূখন্ডের যেকোন অংশে বসবাসকারী নাগরিক নিজের নিজের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার ভোগ করবে। সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, বর্ণ, বংশ বা ভাষার ভিত্তিতে কোনো ব্যাক্তিকে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (৩০নম্বর ধারা)

সংবিধানের ৩০নং ধারা অনুসারে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ সকল সংখ্যালঘু শ্রেনীরই নিজেদের পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার আছে। সরকারি সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বৈষম্য করতে পারে না। বে এর অর্থ এই নয় যে সরকার সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অধ্যাপক এম. ভি. পাইলি তাই বলেন, "Also since the term minority has not been defined in the constitution anywhere and there are advantages in belonging to the minority, groups within the majority Hindu cominunity have started claiming minority status."

৩.২.৬ সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি বাস্তবায়িত বা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রায়শই নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যোগী হয়। এই হস্তক্ষেপ থেকে নাগরিকদের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য

সংবিধানের ৩২ এবং ২২৬ নম্বর ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার লিপিবদ্ধ হয়েছে। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ৩২ নম্বর ধারাকে "the very of the constitution and the very heart of it." অর্থাৎ সংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।

টিপ্পনী

সংবিধানের ৩২নং ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court) পাঁচ ধরনের লেখ (Writ) জারি করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে পারে, যেমন

(ক) বন্দী প্রতক্ষীকরন

'বন্দী-প্রত্যক্ষীকরন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'বন্দীকে আদালতে যথারীতি হাজির করা' অর্থাৎ কোনো ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে তার কারণ দর্শানোর জন্য সুপ্রীম কোর্ট বন্দীর আবেদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বন্দী-প্রত্যক্ঈকরন' লেখটি জারি করে বন্দীকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে। গ্রেপ্তার বেআইনি হলে বন্দীর মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) পরমাদেশ

'পরমাদেশ' শব্দটির অর্থ হল 'আমরা আদেশ করছি'। সুপ্রীম কোর্ট এই 'পরমাদেশ' লেখ জারি করে অধস্তন আদালত, ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তার দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই লেখ জারি করা যায় না।

(গ) প্রতিষেধ

'প্রতিষেধ' শব্দটির অর্থ'নিষেধ করা' প্রতিষেধ কার্য সম্পাদনে সৃষ্টি করে। সুপ্রীম কোর্ট নিম্ন আদালতের ক্ষেত্রে প্রতিষেধ লেখ জারি করতে পারে।

(ঘ) অধিকার পৃচ্ছা

'অধিকার পৃচ্ছা' বলতে বোঝায় 'কোন অধিকারে'। অর্থাৎ কোনো ব্যাক্তি যে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত সেই পদে থাকার যোগ্যতার আছে কিনা সেই বৈধতা সুপ্রীম কোর্ট 'অধিকার পৃচ্ছা' লেখ জারির মাধ্যমে বিচার করতে পারে।

টিপ্পনী

(ঙ) উৎপ্রষন

'উৎপ্রেষন' অর্থ হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া"। নিম্ন কোনো আদালত যদি নিজ এক্তিয়ারের বাইরে যায় তাহলে এই উৎপ্রেষন লেখর মাধ্যমে মামলাকে উচ্চতর আদালতে স্থানান্তরিত করা যায় এবং নিম্ন আদালতের এক্তিয়ার বহর্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়।

৩২ নম্বর ধারাব আরো বলা হয়েছে সংসদ আইন করে লেখসমূহকে বলবৎ করার দায়িত্ব অন্য যে কোন আদালতকে দিতে পারে। ৩২ ধারায় শেষাংশে বলা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের এবং ২২৬ নম্বর ধারা অনুসারে হাইকোর্ট গুলির লেখ জারির ক্ষমতাকে সাধারণ ভাবে সংকুচিত করা যাবে না।

তবে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহের ওপর এত বেশি বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয়েছে যে বাস্তবে এই অধিকার গুলির অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা যাব।

৩.৩ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য

অধিকারের সাথে কর্তব্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পরস্পরের পরিপূরক। অধিকাংশ সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার সমূহ বিধিবদ্ধ থাকলেও কর্তব্যের কোনো উল্লেখ থাকে না। ভারতের মূল সংবিধানে ১২ - ৩৫ নম্বর ধারায় শুধু মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ছিল। কর্তব্যের কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সংবিধানে কোনো কর্তব্য সংযুক্ত ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে দশটি কর্তব্যের সংযোজন হয়েছে। সম্প্রতি আরো একটি কর্তব্য যুক্ত হয়েছে, তাই বর্তমানে সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা এগারোটি। এই কর্তব্যগুলি সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৫১(ক) ধারায় সংযোজিত হয়েছে। কর্তব্যগুলি হল -

(১) সংবিধান মেনে চলা, সংবিধানের আদর্শ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

(২) যে সব মহান আদর্শ জাতিয় সংগ্রামে অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিল সেগুলিকে সংরক্ষণ ও অনুসরন করা।

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা।

(৪) দেশরক্ষা করা এবং আহ্বান জানালে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

(৫) ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক ও শ্রেনীগত ভিন্নতাকে অতিক্রম করে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ গঠন করা এবং নারীর মর্যাদা হানিকর প্রথাসমূহ বর্জন করা।

টিপ্পনী

(৬) ভারতের মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা।

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী ও বন্যপ্রানীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গঠন করা এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ পোষন করা।

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানসিকতা, অনুসন্ধিৎসা এবং সংসারমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার গঠন করা।

(৯) জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা এবং হিংসা বর্জন করা।

(১০) ব্যক্তিগত এবং যৌথ কর্মপ্রচেষ্ঠার মাধ্যমে উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হওয়া।

(১১) পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব হল ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষায় সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত এই কর্তব্যগুলির কতগুলি সহজাত দুর্বলতা আছে। যেমন-

(১) কর্তব্যগুলির অনেক গুলি হয় অস্পষ্ট,নয় সাধারণ মানুষের বিচার বিবেচনার বাইরে অবস্থান করে। যেমন - স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ প্রকৃত পক্ষে কি তা সাধারণ মানুষ বোঝে না।

(২) মৌলিক কর্তব্যসমূহ বিচারযোগ্য নয় (Non Juusticiable)।

এই কর্তব্যগুলি লঙ্ঘিত হলে আদালতে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। এছাড়া ধর্মান্ধতা, আঞ্চলিকতা, ভাষাগত সংকীরর্ণতা প্রভৃতির কারনে কর্তব্যগুলি অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হয়নি।

টিপ্পনী

৩.৪ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের সংবিধানে বর্ণিত 'শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি আলোচনা কর।

(২) ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার আলোচনা কর।

(৩) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বলতে কী বোঝ?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় সংবিধানের বর্ণিত 'সাম্যের অধিকার' সম্পর্কে লেখ?

(২) ভারতীয়দের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটির বিস্তারিত আলোচনা কর?

(৩) ভারতের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩.৫ নিবাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) J.C. Johari, "Indian Constitution and Politics", Vishal Publications, Jalandhar, 2001.

(২) M.V. Pylee, "Indian's Constitution", S. Chand and Co., New Delhi, 2001

(৩) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি", মিত্রম্ কলকাতা, ২০১০

(৪) প্রানগোবিন্দ দাশ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" সেন্ট্রাল, কলকাতা, ২০১১

(৫) কল্যান কুমার সরকার, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি," শ্রীভূমি, কলকাতা ২০১০

রাষ্ট্রীয় নির্দেশমুলক নীতি এবং এর তাৎপর্য

টিপ্পনী

৪.১ - ভূমিকা

৪.২ - নির্দেশমূলক নীতি সমূহ

৪.৩ - রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

৪.৪ - অনুশীলনী

৪.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ - ভূমিকা

সমাজ সততই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা মানুষের ধ্যান ধারণাকে পরিবর্তন করে মানে রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেত্রে পুলিশি রাষ্ট্র থেকে জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারনা বিকশিত হয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে কল্যাণমূলক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্য হল শোষণ মুক্ত সমাজ তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

৪.২ নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ জনকল্যানমূলক আদর্শের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই কারণে আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অনুসরণে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি গুলিকে সংবিধানের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, "Constitute a very comprehensive political, social and economic program for a modern democratic state." সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে। এই নীতিগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

টিপ্পনী

(১) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নীতিসমূহ

সংবিধানের ৩৮ নং ধারায় মূলত সামাজিক নির্দেশ মেলে। এই ধারায় বলা হয়েছে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হবে যাতে ব্যাক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

(২) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরন সংক্রান্ত নীতিসমূহ

সংবিধানের ৩৯, ৪১, ৪২ ও ৪৩ নং ধারাতে অর্থনৈতিক নীতিগুলি স্থান পেয়েছে। ৩৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরন করবে যাতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা, ধনসম্পদ যাতে ব্যাক্তিগত ভাবে কুক্ষিগত না হওয়া, যাতে নারী-পুরুষ সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায়, যাতে শৈশব ও যৌবন শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায় ইত্যাদি।

৪১ন ধারা অনুসারে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও যতটা সম্ভব জনগণের কর্মের ও শিক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকবে। বেকার অবস্থায়, অসুখের সময়, বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় রাষ্ট্র সাহায্য করবে।

৪২নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র কাজকর্মের শর্ত মানবিক করে তুলবে এবং মায়েদের প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে। আর ৪৩ নং ধারায় বলা হয়েছে কৃষি বা শিল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা যাতে জীবনধারনের উপযোগী বেতন, কাজের পর অবসর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা পায় সে ব্যাপারে রাষ্ট্র নজর দেবে ও গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করবে।

(৩) সংবিধানের ৪০, ৪৪ ও ৫০ নম্বর ধারাতে শাসন কাঠামোর উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিগুলি দেখা যায় । ৪০ নম্বর ধারায় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে। ৪৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রের ভিতরে সকল শ্রেনীর নাগরিকদের মধ্যে যাতে একই ধরনের সামাজিক বিধি চালু হয় রাষ্ট্র সেদিকে নজর রাখবে। আবার ৫০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র করতে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নীতিসমূহ

সংবিধানের ৪৫ থেকে ৪৭ নং ধারার মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নীতিগুলি বিধিবদ্ধ হয়েছে। ৪৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে সংবিধান চালু হবার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক - বালিকার আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। ৪৬ নম্বর ধারায় পিছিয়ে পড়া শ্রেনী বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও উপজাতি মানুষদের শিক্ষিতকরতে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। ৪৭ নম্বর ধারা অনুসারে জনগণ যাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জনস্বাস্থের উন্নতি এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা ও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য।

৪৯ নম্বর ধারাতে জাতীয় গৌরববর্ধক বলে ঘোষিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত শিল্পকলা, দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুগুলির রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করে হবে।

(৫) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কিত নীতিসমূহ

ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ভূমিকা ও নীতি গ্রহন করবে তা সংবিধানের ৫১ নম্বর ধারায় ব্যক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা বিধান, বিভিন্নদেশ সমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করতে ভারত সবসময় সচেষ্ট থাকবে।

৪.৩ রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য সম্পর্কে ঐক্যমত নেই। কিছু অর্থিক নীতিগুলি আদালত কর্তক বলবৎ যোগ্য না হওয়ায় এগুলিকে শুধুমাত্র সদিচ্ছার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করেন। আবার এই নীতির প্রবক্তারা মনে করেন রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছতে হলে রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক কোনো বিকল্প নেই। সমালোচনা সত্ত্বেও বাস্তবে নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য্য বর্তমান। যেমন -

(১) রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিতের শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ বা সদইচ্ছার প্রকাশ নয়, এগুলি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশমূলক নীতিগুলির অবদান অপরিহার্য।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ইত্যাদি। আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যা শুধু যে ব্যবহারিক জগতে আমাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছে তা নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরম উৎকর্ষ সাধন করেছে।

(২) রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিতে যে সমস্ত নীতি ঘোষিত হয়েছে সেগুলি আইন প্রনয়নের সময় রাজ্যগুলি কার্যকর করছে কিনা তা দেখা কেন্দ্রের কর্তব্য। যেমন - নারী-পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান বেতন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) নির্দেশমূলক নীতিগুলি আইন কতৃক বলবৎযোগ্য না হলেও সুপ্রীম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রেই নির্দেশমূলক নীতির ভিত্তিতে আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করেছেন। যেমন - এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (১৯৫১) বিহার বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২) প্রভৃতি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দান প্রসঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন।

(৪) রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ন তাৎপর্য হল সাংবিধানিক উপায়ে সমাজের পরিবর্তন গঠন করা। যেমন - রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ঘোষিত হয়েছে তার মধ্য দিএয়েগ্রামীন সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

(৫) রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলির ব্যাপক শিক্ষাগত মূল্য আছে। এই নীতিগুলিতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা ধ্বনিত হয়েছে। এই নীতিগুলি জনগণকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

(৬) রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলি শুধুমাত্র জনগণকেই সচেতন করে না। সরকারকে ও তার নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

এম. সি. শীতলবাদের বলেন, Although the Directive Principles of State policy centers no legal rights and create no legal remedies, they appear to be like an 'Instrument of Insturuetions' or general recommendations addressed to all authorities in the union reminding them of the basic principles of the new social and economic order which the constitution aims at building." সুতরাং এককথায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল ভারতীয় জনগণের ন্যূনতম আশা আকাঙ্খার প্রতীক।

৪.৪ অনুশীলনী

(১) ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি আলোচনা কর?

(২) নির্দেশমূলক বা নীতিগুলির তাৎপর্য নিরূপন কর?

৪.৫ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", মিত্রম, কলকাতা, ২০১০

(২) কল্যান কুমার সরকার, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" শ্রীভূমি, কলকাতা, ২০১০

(৩) প্রানগোবিন্দ দাশ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজীতি" সেন্ট্রাল, কলকাতা, ২০১১.

(৪) অনাদিকুমার মহাপাত্র, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(৫) J.C.Johari, "Indian onstitution and Politics" Vishal publication, Jalandhar, 2001.

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

টিপ্পনী

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

১.১ ভূমিকা

১.২ - ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশধারা

১.৩ - সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন?

১.৪ - ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ - ভূমিকা

কোন রাষ্ট্রকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কোনো একটি শ্রেনীতে সুনির্দিষ্ট ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দুরূহ, কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বকীয়তা আছে, ভারত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ও এরই কথা প্রযোজ্য। তবুও বহু ভারত বিশেষজ্ঞ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন অনেকে আবার ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। তবে সংবিধান প্রনেতাগণ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলেন সংবিধানের ১(১) ধারায় বলা হয়েছে "India that is bharat, shall be a union of states" ভারতকে কোন রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন বলে অভিহিত করা হয়েছে তার সদূত্তর গণপরিষদের বির্তকে পাওয়া যায়। খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ বি আর আম্বেকর বলেন যে তারা ইচ্ছে করেই যুক্তরাষ্ট্র পরির্বতে রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ-

(১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে চুক্তি করে গড়ে ওঠেনি, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ডে তাই হয়েছিল।

(২) অঙ্গ রাজ্যগুলির ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা নেই যা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রযোজ্য ছিল।

টিপ্পনী

১.২ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশধারা (Development of Indian Federation)

ভারতের শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক না যুক্তরাষ্ট্রীয় এ নিয়ে বিতর্ক আছে। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করলেও অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোকে 'আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Quasi federal) বলে অভিইত করেছেন। আবার অন্যরা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র', 'সামরিক যুক্তরাষ্ট্র', 'আপসমূলক যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করায় অস্টিন বলেন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো এতই বিচিত্র যে তার কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রায়ন সম্ভব নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো তার সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে, ভারত ও এর ব্যাতিক্রম নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো অন্যান্য দেশে প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভিত্তি করে বিকশিত হয়নি। সে তার নিজের দেশের অর্থ সামজিক প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে। তাই অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মাপকাঠিকতে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন করতে গেলে ভুল হবে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মূলত দুটি পদ্ধতি বর্তমান। প্রথমত : কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বেচ্ছাকৃতভবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। যেমন - সুইজার ল্যান্ডে ১৩টি ক্যান্টন প্রতিবেশীদের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এই পদ্ধতিটি সংহতিমূলক । দ্বিতীয়ত : একটি বড় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে বিভাজন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্র এভাবেই গঠিত এই পদ্ধতি বিভক্তিকরন (Method of disintegration) নামে পরিচিত।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংহতি মূলক এবং বিভক্তিকরন পদ্ধতির সংমিশ্রনে গঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ভারত-একাধারে ইংরেজ শাসিত ভারত এবং অন্যধারে দেশীয় রাজ্যে বিভাজিত ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ইংরেজ শাসিত ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তভূক্ত হয়। দেশ শাসনের সুবিধার্থে ব্রিটিশ ভারতকে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য বিভাজন করা হয়। দেশীয় রাজাদের স্বেচ্ছায় এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। এই ভারত শাসন আইনে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাস্তব রূপ লাভ করলেও ঐ আইনে সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রাধান্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম তালিকায় বিভাজন করা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। তবে প্রয়োজনে গভর্নর জেনারেল প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেবার অধিকারী ছিলেন। তাই এই ব্যবস্থা কার্যত ছিল একটি সীমাবদ্ধ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার নামান্তর।

টিপ্পনী

ভারতীয় গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের রূপরেখা স্থির করে। ইংরেজ আমলের যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্বিন্যাস করে । ব্রিটিশ আমলের মত স্বাধীন ভারতে বিভক্তিকরনের পদ্ধতি ইরেজ শাসিত প্রদেশগুলিকে অঙ্গরাজ্য পরিণত করে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংহতিমূলক পদ্ধতি অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করা হয় । পরবর্তীকালে ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যসমূহকে পুনর্গঠন করা হয়েছে । এর ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত বিদ্যমান।

১.৩ সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন?

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধন অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসির মতে তাই "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintance of state rights. it is a union without unity." বহুভাষাভাষি ও বহু মতাবলম্বী ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প কী আছে ? প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পিছনে নানা কারণ বর্তমান। যেমন-

(১) বিশাল আয়তন

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রধান কারন হল আয়তনের বিশালতা। উত্তরে জন্মু-কাশ্মীর থেকে দক্ষিনে কন্যাকুমারি এবং পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ থেকে পশ্চিমে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতে জনসংখ্যা ১২০কোটির বেশী। তাই এক কেন্দ্র থেকে এতো বড়ো ও বৈচিত্রপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিচালনা অসম্ভব। ফলত সংবিধান প্রনেতাগণ ভারতে এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অধিক কাম্য বলে মনে করেন।

টিপ্পনী

(২) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র

ভারতীয়দের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যপক বৈচিত্র দেখা যায়। এই বৈচিত্র আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতার চেতনাকে গড়ে তোলে। আঞ্চলিক বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হলে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা যথেষ্ঠ নয়; তাই ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

(৩) দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির স্বার্থে

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬২টি, এগুলি দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। তাই দেশীয় রাজারা নিজেদের স্বতন্ত্র সম্পূর্ন বিসর্জন দিয়ে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হতে অনাগ্রাহী ছিল ; অথচ এদের ভারতীয় মূল স্রোতে যুক্ত করতে না পারলে স্বাধীনতা অনেকাংশেই মূল্যহীন হয়ে পড়ত। তাই নেহরু ও সর্দার প্যাটেল তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকেই শ্রেষ্ঠ বিকল্প মনে করেন।

(৪) গণতন্ত্রের স্বার্থে

ভারতে গণতন্ত্রের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে সাধারন মানুষ শাসন পরিচালনায় অংশ নিতে পারত না। অথচ সব গণতান্ত্রিক মানুষই সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহনে আগ্রহী। ভারতে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যপক সংখ্যক মানুষের শাসন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহন সুনিশ্চিত হয়েছে।

(৫) প্রাদেশিক নেতৃত্বের মনোভাব

ভারতে প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ববস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ইতিমধ্যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে তাঁরা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র ও ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেন।

(৬) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসিক অভিজ্ঞতা স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্র

গঠনের অনুকূলে ছিল। ১৯৩৭ সাল থেকে ভারতের নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন। প্রশাসনিক সংস্থার ও তার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সপক্ষে মতামত দেয়। তাই ব্রিটিশ ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদ্যমান ছিল তাকে পরিমার্জিত ও পুনবিন্যাস করে গ্রহন করাই সংবিধান প্রনেতাদের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

টিপ্পনী

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রূপায়নে উৎসাহিত করে।

১.৪ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of Indian Federation)

ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। সংবিধান গ্রহনের প্রাক্কালে ডঃ বি. আর আম্বেদকর বলেন "ভারত ইউনিয়নের রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ন্যায় তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বওম"। জি.এন. যোশী বলেন, "ভারত ইউনিয়ন প্রকৃত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র নয়; এটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ন এককেন্দ্রিক উপাদানসহ একটি আধাযুক্তরাষ্ট্র - সামরিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু জরুরী অবস্থায় এককেন্দ্রিক হিসাবে কাজ করে।" অধ্যাপক কে.সি হোয়ার আবার ভারতকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক জে.সি জোহারী"ভারতকে এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রের মডেল" বলে অভিহিত করেছেন। তবে ভারতীয় সংবিধানের ১ নম্বর ধারায় ভারতকে 'কতিপয় রাজ্যের ইউনিয়ন" (Union of State) বলে ঘোষনা করা হয়েছে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইউনিয়ন' শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের সমার্থক এবং দক্ষিন আফ্রিকার প্রক্ষাপটে 'ইউনিয়ন' শব্দটি এককেন্দ্রিক সরকারের সমর্থক। তাই ভারত "প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র" কিনা তা ভারতের সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব হবে।

অধ্যাপক এ.ভি.ডাইসি; কেসি হোয়ার প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য ৬টি। যথা-

(১) দুই শ্রেনীর সরকার

(২) লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বন্টন।

টিপ্পনী

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

(৪) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

(৫) অঙ্গরাজ্যের স্বতন্ত্র সংবিধান

(৬) দ্বিনাগরিকতা

এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে আখ্যয়িত করতে পারি।

(১) দুই শ্রেনীর সরকার

ভারতে দুই শ্রেনীর সরকার তথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিদ্যমান। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিদ্যমান। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্যে রাজ্য সরকার, যথা - আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা, ঝাড়খড প্রভৃতি ২৯টি অঙ্গরাজ্যে রাজ্য সরকার রয়েছে। উভয় সরকারই সংবিধান অনুমোদিত এবং তাদের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান।

(২) লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বন্টন

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দুই শ্রেনির সরকারের মধ্যে লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দ্বারা ক্ষমতার বন্টন। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের জন্য সংবিধানের সপ্তম তপশিলে ৩টি তালিকা - কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় ক্ষমতা বন্টিত আছে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অপরিহার্য। এই আদালত নিরপেক্ষ ভাবে সংবিধান ব্যাখ্যা করে। কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের নিষ্পত্তি করে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। এই কারনেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের অস্তিত্ব বর্তমান, এই আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা। সুপ্রীমকোর্ট পাঁচ প্রকারের লেখ জারি রক্ষা করে থাকে।

(৪) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতে লোকসভা ও

রাজ্যসভা নিয়ে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা বর্তমান। জানগনের প্রত্যক্ষ ভোটে লোকসভার প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। আর অঙ্গরাজ্য গুলোর পরোক্ষভাবে নির্বাচনের ভিত্তিতে রাজ্যসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন । তবে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যভিত্তিক না হয়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত।

টিপ্পনী

(৫) অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি পৃথক সংবিধান থাকা আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ৫০টি স্বতন্ত্র সংবিধান আছে। এই সব রাজ্যের সংবিধান জাতীয় সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হয়। ভারতে কেবল একটি অঙ্গরাজ্য জন্মু ও কাশ্মীর স্বতন্ত্র সংবিধান আছে এবং মূল সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা দ্বারা তা অনুমোদিত।

(৬) দ্বিনাগরিকতা

দ্বিনাগরিকতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। ব্যাক্তিকে প্রথমে কোন অঙ্গরাজ্যের নাগরিকতা অর্জন করতে বে এবং কোন রাজ্যের নাগরিকতা লাভের পরই ব্যাক্তি জাতীয় নাগরিকতা লাভ করে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভের পূর্ব শর্তই হল নিজ নিজ রাজ্যের নাগরিকতা লাভ। ভারতে এই "দ্বিনাগরিকতা' ব্যবস্থা অনুসরন করা হয়নি।

এই আলোচনার নিরিখে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ছ'টি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভারতে অধিকাংশই বিদ্যমান । তাই আপাতভাবে ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই । অধ্যাপক দূর্গাদাস বসু তাই বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলির সবই ভারতে বিদ্যমান।"

তবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করার ক্ষেত্রে কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। এগুলি হল-

(ক) গঠনগত দিক থেকে ভারতকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে একীকরন ও বিভক্তিকরন পদ্ধতি অনুসারে, ভারতে দুটি পদ্ধতির কোনটিই যথার্থভাবে অনুসরন করা হয়নি।

(খ) পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে দু'ধরনের সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য

টিপ্পনী

সরকার দেখা যায়। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিশেষ ধরনের সরকার বিদ্যমান।বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া ২৯টি রাজ্য সরকার এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার আছে।

(গ) "রাজ্যে সমতার" নীতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ হল প্রতিটি রাজ্য সমমর্যাদা সম্পন্ন। অর্থাৎ রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভৌগলিক অবস্থাগত পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি রাজ্য উচ্চকক্ষে সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণে সক্ষম। ভারতে রাজ্য সমতার নীতি অনুপস্থিত। এখানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্য প্রেরনের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়েছে।

(ঘ) ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র না বলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কারণ হল সংবিধানের দুস্পরিবর্তনীয়তার অভাব। অথচ পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপুর্ন বৈশিষ্ট্য হল দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এবং তার মাধ্যমে ক্ষমতার বন্টনকে সুনিশ্চিত করা কিন্তু ৩৬৮ নম্বর ধারায় ভারতের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি প্রকৃতি গতভাবে সুপরিবর্তনীয়তার দ্যোতক ভারতে আজ পর্যন্ত সংবিধান ১০০ বারের ও বেশী সংশোধীত হয়েছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের অধিক সময়ে মাত্র ২৬ বার সংবিধান সংশোধন হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ভারতকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলতে আপত্তি জানান।

১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

(২) যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ভারত কী যুক্তরাষ্ট্র - ব্যাখ্যা কর?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের 'যুক্তরাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে ওঠার পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা কর।

(২) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষন কর।

১.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) D. D. Basu, "Commentary on the Constitution of India" M.C. Sarkar and Co., Calcutta - 1965-1968

(২) M.V/ Pylee, "India's Constitution" S. Chanda and Co. new Delhi, 2001

(৩) Bidyut Chakraborty and Rajendra Kumar Pandey, "Indian Government and Politics", Sage Publication, New Delhi, 2008.

(৪) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্রম, কলকাতা, ২০১০.

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভারতে কেন্দ্র - রাজ্য সম্পর্ক

টিপ্পনী

২.১ - ভূমিকা

২.২ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৩ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৪ - ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থিক সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

২.৫ - কেন্দ্র-রাজ্য বিতর্ক : সারকারিয়া কমিশন

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী।

২.১ ভূমিকা

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টনের মূলত দুটি ধারা দেখা যায় - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারা এবং কানাডীয় ধারনা। অর্থাৎ যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবশিস্ট ক্ষমতা রাজ্যের হাতে ব্যস্ত থাকে তারা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারা অনুসরন কারী এবং যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তারা। কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত। অধ্যাপক এ. ভি. ডাইসি বলেন, "কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বনন্ঠন মত সুচারু হবে; যুক্তরাষ্ট্রের ভবিস্যৎ তত উজ্জল হবে"।

গণপরিষদের ভারত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে ডঃ বি. আর আম্বেদকর বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ভারতের সংবিধানে দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির হাতে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি সৃষ্ট এবং ভারতের সংবিধানই উভয় ধরনের সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস। ভারতীয় সংবিধানে কানাডায় সংবিধানের অনুসরনে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের কথা

উল্লিখিত আছে।

ভারতে ক্ষমতা বন্টন নীতিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষনে গণপরিষদে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, এখও তার অবসান হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ এই বিতর্ককে আরো তীব্রতর করে তুলেছে। যাইহোক, ভারতের কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক তিন দিক থেকে বিচার করা হয়- আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন এবং অর্থিক ক্ষমতা বন্টন। তাই ভারতের সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ অংশে ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বন্টিত হয়েছে তা আলোচনা করা হল।

টিপ্পনী

২.২ ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন (Distribution of Legislative Power between the Central and the states in India)

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য গুলির মধ্যে যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন হয়েছে তা কোনো একটি দেশের অনুকরনে গড়ে ওঠেনি। ভারতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক পরম্পরা অনুসারে তথা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (The Government of India act, 1935) অনুসারে গড়ে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম তপশিলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে তিনটি তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই তিনটি তালিকা ছিল যথাক্রমে - কেন্দ্রীয় তালিকা, প্রাদেশিক তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় ৫৯টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তালিকা ভুক্ত বিষয় গুলি হল সর্বভারতীয় বিচারে গুরুত্বপূর্ন, যেমন - প্রতিরক্ষা,. পররাষ্ট্র, মুদ্রা প্রচলন, ব্যাঙ্ক, রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ল এই ৫৯টি বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। প্রাদেশিক তালিকায় ছিল ৫৫টি বিষয় যা আঞ্চলিক দিক থেকে ব্যপক গুরুত্বপূর্ন ছিল। যেমন - জন শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি। যুগ্ম তালিকায় ৩৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিবাহ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি

আইন, সংবাদপত্র ইত্যাদি হল যুগ্ম তালিকাভুক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই তালিকা বহির্ভূত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ (Residuary Power) গর্ভনর জেনারেলের হাতে ন্যাস্ত ছিল।

স্বাধীন ভরতে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান ভারত সংবিধানের একাদশ অংশে ২৪৫ থেকে ২৫৫ ধারায় এবং সপ্তম তপশিলে কেন্দ্র ও রাজ্যে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের বিস্তৃত বিবরণ মেলে। সপ্তম তপশিলে বর্ণিত তিনটি তালিকা হল-কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা।

টিপ্পনী

কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List)

ভারতীয় সংবিধান গ্রহনকালে কেন্দ্রীয় তালিকার ৯৭টি বিষয় ছিল, তবে পরে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট বিষয়ের সংখ্যা ৯৯। ভারতে জাতীয় স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল - প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, রেল, ডাক, মুদ্রা, বীমা, আন্তর্জাতিক বানিজ্য, আয়কর, আমদানি-রপ্তানি, নাগরিকতা, পারমানবিক শক্তি, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি। ২৪৬ (১১) ধারা অনুসারে এই সমস্ত বিষয়ে একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রনয়ন করতে পারে।

রাজ্য তালিকা (State List)

মূল সংবিধানে রাজ্য তালিকায় মোট ৬৬টি বিষয় ছিল। পরবর্তিকালে বেশ কিছু রদবদল হব এবং বর্তমানে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ৬১টি। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আঞ্চলিক স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল - পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা, ভূমি ও রাজস্ব, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট,মৎস্য, সমবায় সমিতি, জমি-বাড়ি, যানবাহনের ওপর কর, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উল্লেখযোগ্য। সাধারনভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়নের অধিকারী রাজ্য আইনসভা।

যুগ্ম তালিকা

মূল ভারতীয় সংবিধানে যুগ্ম তালিকার ৪৭টি বিষয় ছিল। পরবর্তী সময়ে তা বৃদ্ধি

টিপ্পনী

পেয়ে বর্তমানে ৫২টি হয়েছে। কানাডার সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় কানাডায় যুগ্ম তালিকার মাত্র ৩টি বিষয় লিপিবদ্ধ। যাইহোক যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - বিবাহ, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষা, বন, বন্যপ্রানী প্রভৃতি। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ওপর কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রনয়ন করতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় বিস্তারিত ক্ষমতা বন্টন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সুনিশ্চিত হলেও সংবিধানের এমন কতকগুলি ধারা আছে যেখানে আইনগত ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আইন প্রনয়নে কেন্দ্র প্রবনতার লক্ষনগুলি হল -

(ক) অবশিষ্ট ক্ষমতা

কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনপ্রনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা - এই তিনটি তালিকা থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু বিষয় আছে যা এই তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় , একে অবশিষ্ট ক্ষমতা বলা হয়। সংবিধানের ২৪৮ নম্বর ধারা অনুসারে এই অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রনয়নের একমত্র অধিকারী হিসেবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ক্ষমতা ন্যাস্ত হয়েছে।

(খ) জাতীয় স্বার্থ

ভারতীয় সংবিধানে ২৪৯ ধারায় বলা হয়েছে, রাজ্যসভার উপস্থিত ও ভোটাধিকার সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রনয়ন করতে পারে। তবে এই আইনের মেয়াদ এক বছর এবং পরে একই প্রস্তাবের মাধ্যমে এই মেয়াদ এক বছর করে বাড়ানো যায়।

(গ) জাতীয় জরুরি অবস্থা

ভারতীয় সংবিধানের ২৫০ ধারা অনুসরে দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে কেন্দ্র সমগ্র ভারত অথবা যে কোনো অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে। ১৯৬২, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা বলবৎ হয়েছিল।

(ঘ) কেন্দ্রীয় আইনের সাথে সংগতিপূর্ন

ভারতীয় সংবিধানের ২৫১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে জাতিব জরুরিঅবস্থা বা জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্টে প্রনীত কোনো আইন রাজ্য বিধানসভা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ন না হলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে রাজ্য আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ অংশ প্রযুক্ত হবে না।

টিপ্পনী

(ঙ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধ

সংবিধানের ২৫২ নং ধারা অনুসারে দুই বা ততোধিক রাজ্য কেন্দ্রকে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে অনুরোধ জানালে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে। তবে এই আইন অনুরোধকারী রাজ্য গুলোর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য হবে। কিন্তু রাজ্যগুলি এই আইনের কোনো রকম পরিবর্তন করতে পারে না।

(চ) আন্তর্জাতিক চুক্তি

সংবিধানের ২৫৩ নম্বর ধারা অনুসারে পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি বা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবকে কার্যকর করতে সমগ্র ভারত বা ভারতের অংশ বিশেষের জন্য আইন প্রনয়ন করতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের একমাত্র অধিকারী। তবে এই ধারার প্রয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্র সহজেই রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

(ছ) রাজ্য জরুরি অবস্থা

৩৫৬ নম্বর ধারা অনু সারে কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন কোনো রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে তাহলে ঐ রাজ্যে তিনি রাজ্য জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন এই ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে কেন্দ্রিয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন প্রনয়নের অধিকারী হয়।

(জ) রাজ্যপাল ও রাজ্য আইন

স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইনসভা বিল পাস করার পর

টিপ্পনী

তা আইনে পরিণত হতে হলে রাজ্যপাল সম্মতি প্রয়োজন। অর্থবিল ছাড়া আইনসভা অনুমোদিত যে কোন বিল তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে বা পুনর্বিবেচনা করার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। এ কারণেই কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে রাজ্যপাল রাজ্য আইন প্রনয়নে বাধা সৃষ্টি করতে এবং কেন্দ্রের কাছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করতে পারেন।

বস্তুত ভারতের মত বৈচিত্র্যময় দেশে যেখানে নানা ভাষা, নানা মত বিরাজমান সেখানে বিভিন্ন জাতির আশা আকাঙ্খাকে যধাযথ মর্যাদা দান এবং অঙ্গরাজ্য গুলির স্বাতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিরোধে পুনর্বিবেচনা একান্তই জরুরি।

২.৩ ভারতে কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন যেমন প্রয়োজন তেমনি শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন ও জরুরি। কারণ সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত লেখা না থাকলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ থেকে ২৬৩ ধারা সহ অন্যত্র বিশদভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক দূর্গাদাস বসু বলেন, "The distribution of executive powers before the union and the states is some what more complacent them that of the legislative powers".

ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে পার্লামেন্টে যেসব বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। সন্ধি ও চুক্তির কারণে ভারত সরকার যেসব ক্ষমতা ভোগ করে সেসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। আবার ১৬২ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকমাভুক্ত যে সব বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রনয়নের অধিকারী সেসব বিষয়গুলির ওপর রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী।

তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের মত

প্রশাসনিক ক্ষমতা বন্টনেও অস্বাভাবিক কেন্দ্রে প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

(১) শাসনকার্যে কেন্দ্রীয় নির্দেশদান

সংবিধানের ২৫৬ ধারা অনুসারে প্রতিটি রাজ্য শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা এমন ভাবে প্রয়োগ করবে যাতে পার্লামেন্ট প্রনীত আইনের সাথে তা সংগতিপূর্ন হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রনীত আইনকে কার্যকর করা রাজ্য শাসন বিভাগের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অধ্যাপক দূর্গাদাস বসু বলেন , "It shall be the constitutional duty of every state to enforce union orders applicable in the state ."

টিপ্পনী

(২) কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য বিধান

সংবিধানের ২৫৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে অঙ্গরাজ্যগুলিকে শাসন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যহত না হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে রাজ্যকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাজ্য শাসন বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই।

(৩) জাতিয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় নির্দেশদান

সংবিধানের ২৫৭ (২) ও (৩) ধারা অনুসারে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা সামরিক কারনে প্রয়োজন মনে হলে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাজ্য সরকারগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজ্যমধ্যে রেলপথ সংরক্ষনের নির্দেশ দিতে পারে। তবে এই ধরনের কেন্দ্রীয় নির্দেশ পালনের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ব্যায় হলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যয়ভার বহন করবে।

(৪) রাজ্য সরকারের ওপর বিশেষ দায়িত্ব আরোপ

ভারতীয় সংবিধানের ২৫৮ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর কতগুলি বিশেষ কর্মসম্পাদানের দায়িত্ব দিতে পারেন। এই দায়িত্ব রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রে পালন বাধ্যতামূলক। তবে এই দায়িত্ব পালন শর্তসাপেক্ষ বা শর্তহীন হতে পারে।

টিপ্পনী

(৫) পরে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির দায়িত্বভার

সংবিধানের ২৬০ ধারা অনুসারে যে সমস্ত অঞ্চল ভারত ভূ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সেইসব অধিগৃহীত ভূখন্ডের প্রশাসনিক, আইনগত ও বিষয় সংক্রান্ত কার্য কেন্দ্রের হাতে ন্যাস্ত হবে। যেমন - গোয়া, দমন দিউ ইত্যাদি ভারতীয় ভূখন্ডে মুক্ত হওয়ার সময় পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলি ঐ সমস্ত এলাকায় প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রথমে লাভ করেনি; কেন্দ্রই ওই সব এলাকার প্রশাসনিক ভার লাভ করে।

(৬) সরকারি আইন, নথি ও বিচার বিভাগের রায় সারা দেশে প্রযোজ্য হবে

২৬১ ধারায় বলা আছে সরকারি আইন, নথি ও বিচার বিভাগের রায় সারা দেশে প্রযোজ্য হবে। এগুলি কীভাবে কার্যকর বে সে বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেয়। অর্থাৎ ২৬১ ধারাতেও প্রশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়।

(৭) আন্তঃরাজ্য বিষয়ে কেন্দ্রের প্রাধান্য

সংবিধাননের ২৬২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যদি আন্তরাজ্য নদী বা নদী উপত্যাকা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে পার্লামেন্টে সে বিষয়ে আইন প্রনয়ন করে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। এমনকি পার্লামেন্ট আইন করে এসব ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বা অন্যান্য আদালতের হস্তক্ষেপ সীমবদ্ধ করে দিতে পারে। পার্লামেন্ট ১৯৫৬ সলে "আন্তরাজ্য জল সংক্রান্ত বিরোধ আইন" (Inter state water Dispute Act, 1956) রচনা করেন আন্তরাজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য।

(৮) আন্তরাজ্য পরিষদ গঠন

সংবিধানের ২৬৩ ধারাতে আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রও রাজ্যের মধ্যে সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter state council) গঠন করতে পারেন। আন্তঃরাজ্য পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্যগুলির সঙ্গে বিরোধের কারন অনুসন্ধান করে তার নিষ্পত্তি করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন পর্ষদ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপরিষদ প্রভৃতি সংস্থাগুলির সদস্য নিয়োগের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনকে প্রসারিত করে থাকে।

(৯) রাষ্ট্রকতৃক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ

ভারতীয় সংবিধানের ৩১২ নম্বর ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের (UPSC) মাধ্যমে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কর্মচারী যথা I.A.S, I.P.S. রা নির্বাচিত হন। এঁরা যেসব রাজ্যে নিযুক্ত হন সেইসব রাজ্য থেকে বেতন, ভাতা, ঘরভাড়া ইত্যাদি পেয়ে থাকেন, কিন্তু এঁদের চাকরির শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই রাজ্যে বলবৎ করে থাকে। এই সব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। এঁরা কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার কেন্দ্রের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই বলা যায়, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের মতো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক এম. ভি. পাইলি তাই বলেন "Such sharing of sovereign powers by different governments (one national and 29 state governments) under the same constitution is possible only under a federal system and that is what makes India a federal union and its constitution a federal constitution."

২.৪ ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থিক ক্ষমতা বন্টন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act), অনুসরন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টন নীতিকে ভারতীয় সংবিধানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আইনে রাজস্বের উৎসগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অংশে ২৬৪ ধারা থেকে ৩০৭ ধারায় বিস্তারিত ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থিক সম্পর্ক বর্ণনা করা আছে। আলোচনার সুবিধার্থে ভারতের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা চারটি দিক থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন - কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন, কেন্দ্রীয় অনুদান, ঋনগ্রহন ও অর্থকমিশন কতৃক রাজস্ব বন্টনের সুপারিশ।

(ক) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন

ভারতে রাজস্ব বন্টন সংক্রান্ত দুটি তালিকা আছে। কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় ১৩টি বিষয় আছে, যেমন - কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, আয়কর, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি প্রধান। রাজ্য তালিকায় ১৯ টি বিষয় আছে যার মধ্যে ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়কর, বিদ্যুৎ কর, আমোদ প্রমোদ কর, যানবাহন কর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।ভারতে অবশিষ্ট সকল বিষয়ে (Residuary Subject) উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই ন্যাস্ত। তবে ভারতে কেন্দ্র রাজ্যের অর্থিক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো যুগ্ম তালিকা নেই।

কেন্দ্রীয় তালিকা

ভারতীয় সংবিধানের ২৬৮ থেকে ২৭২ নম্বর ধারায় কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত করের রূপরেখা মেলে এবং তাকে পাঁচটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমত - সংবিধানের ২৬৮ ধারা অনুসারে কতগুলি কর আছে যা আরোপ করে কেন্দ্র কিন্ত কর সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যগুলি। স্টাম্প ডিউটি,ঔষধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী এই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত - সংবিধানের ২৬৯ নম্বর ধারা অনুসারে কতগুলি কর কেন্দ্র আরোপ করে ও সংগ্রহ করে। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। এই বন্টন নীতি সংসদ আইন করে নির্ধারন করে। রেলপথে যাত্রী ও পন্যের ভাড়ার ওপর কর, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য কর অকৃষি সম্পত্তির ওপর কর এই শ্রেনীর অন্তর্গত।

তৃতীয়ত - সংবিধানের ২৭০ ধারা অনুসারে কতগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সযরকার আরোপ করে এবং সংগ্রহ করে ; কিন্তু সংগৃহিত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। এই রাজস্ব বন্টন কীভাবে হবে তা অর্থ কমিশন নির্ধারন করে। আয়কর (অকৃষি) ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এই শ্রেনীভুক্ত।

চতুর্থত - সংবিধানের ২৭১ ধারা অনুসারে ২৬৯ ও ২৭০ ধারায় উল্লিখিত কর ও শুল্কের ওপর কেন্দ্র অতিরিক্ত কর ও শুল্ক ধার্য করতে পারে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত সকল বিষয়ে কেন্দ্র এককভাবে কর আরোপ, সংগ্রহ ও ভোগ করে, যেমন আমদানি কর, কোম্পানির ওপর ধার্য কর। তবে এই সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রএককভাবে ভোগ করতে পারে।

পঞ্চমত - ২৭২ নম্বর ধারা অনুসারে ঔষধ ওপ্রসাধন সামগ্রী ছাড়া অনভান্য দ্রব্যের ওপর কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক সূত্রে কেন্দ্র রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই সুত্রে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ইচ্ছা করলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টন করতে পারে। তবে এই বন্টন নীতি অর্থ কমিশন স্থির করে - তবে এই বন্টন বাধ্যতামূলক নয়।

টিপ্পনী

রাজ্যতালিকা

রাজ্য তালিকায় ১৯টি বিষয়ে রাজ্য কর আরোপ, সংগ্রহ ও ভোগ করতে পারে বলে সংবিধানে বলা আছে। তবে রাজ্যের এই ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। কর আরোপের ক্ষেত্রে রাজ্য নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই সীমাবদ্ধতা গুলি হল -

প্রথমত - সংবিধানের ২৭৬ নম্বর ধারায় বলা আছে , রাজ্য তালিকাভুক্ত পেশাগত কর আরোপ ও সংগ্রহের ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যের ; তবে এই কর কখনই ২৫০ টাকার বেশী হবে না। তবে ১৯৮৬ সালে ৬০ তম সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য ২৫০০টাকার বেশী পেশা বা বৃত্তি কর আরোপ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত - সংবিধানের ২৮৫ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির ওপর রাজ্য সরকারের কর আরোপের ক্ষমতা পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। রেলের জমি বা কেন্দ্রের কলকারখানার ওপর কর আরোপের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রবোজ্য।

তৃতীয়ত - সংবিধানের ২৮৬ নম্বর ধরা অনুসারে রাজ্য সরকার আমদানি - রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্রয় - বিক্রয়ের ওপর কোনো বিক্রয় কর ধার্য করতে পারে না।

চতুর্থত - সংবিধানের ২৮৭ ধারা অনুসারে ভারত সরকার বা ভারত সরকারের কোনো সংস্থা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সংসদের অনুমোদন ছাড়া রাজ্যগুলি কোনো কর আরোপ করতে পারে না। যেমন রেল রাজ্যগুলিতে ব্যাপক পরিমানে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও কোনো রাজ্যই বিদ্যুৎ কর ধার্য করতে পারে না।

পঞ্চমত - সংবাদপত্র ছাড়া যে সব দ্রব্য আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বাণিজ্যে বিক্রয় হয়, সেগুলির ওপর রাজ্য কর ধার্য করতে পারে না, এগুলির ওপর কর ধার্যের ক্ষমতা এককভাবে পার্লামেন্টের হাতে ন্যাস্ত।

টিপ্পনী

ষষ্ঠত - সংবিধানের ২৮৮ ধারা অনুসারে আন্তঃরাজ্য নদী বা নদী উপত্যাকা কতৃক মজুতকৃত জল বা বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বন্টন বা বিক্রয়ের ওপর রাজ্য সরকার কোন কর আরোপ করতে পারে না। দামোদর নদী উপত্যকা এর নিদর্শন।

সপ্তমত - রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা বলবৎ করলে ৩৫৪ ধারা অনুসারে ঐ সময়কালে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রয়োগ করে তার কর ধার্য রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন।

অষ্টমত - সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুসারে অর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি রাজ্য আইনসভায় গৃহীত অর্থবিল তাঁর অনুমোদনের জন্য সংরক্ষনের নির্দেশ দিতে পারেন। তবে আজ পর্যন্ত অর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় নি।

সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের চিত্র পর্যালোচনা করলে কেন্দ্রের প্রাধান্য সহজেই প্রতীয়মান হয়।

(খ) কেন্দ্রীয় অনুদান

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারত অঙ্গরাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নে প্রক্রিয়াকে অব্যাহিত রাখতে সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের সংস্থান আছে। এর লক্ষ্য হল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থিক সমতা বিধান করা। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য দু' প্রকারে হতে পারে - নির্দিষ্ট সাহায্য এবং সাধারন সাহায্য।

(গ) ঋণগ্রহন

সংবিধানের ২৯২ ধারা বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন দেশের অভ্যন্তর থেকে বা বিদেশ থেকে ঋন সংগ্রহ করতে পারে, তেমনি আন্তর্জাতিক চুক্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার ঋন নিতে পারে। যেমন - বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ভারত বহু প্রকল্পের জন্য ঋন নিয়ে থাকে। অন্যদিকে রাজ্যগুলি ২৯৩ ধারা অনুসারে কেবল দেশের অভ্যন্তর থেকে ঋন সংগ্রহ করতে পারে এবং বিদেশ থেকে সরাসরি ঋন গ্রহনের ক্ষমতা নেই।

(ঘ) অর্থ কমিশন

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থিক সম্পর্ক নির্ধারনে অর্থ কমিশন গুরুত্বপূর্ন

ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুসারে ভারতে একটি অর্থ কমিশন নিয়োগের কথা বলা আছে। এই অর্থ কমিশন সাধারন ভাবে পাঁচ বছর অন্তর গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠন করে। অর্থ কমিশনে নিযুক্ত সভাপতির সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং অন্যান্য সদস্যদের হাইকোর্টের বিচারপতি পদের যোগ্যতা বা অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং হিসেব নিকাশের অভিজ্ঞতা বা অর্থনীতিবিদ হিসেবে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

টিপ্পনী

সুতরাং কেন্দ্র রাজ্যের আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের মত অর্থিক ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

২.৫ কেন্দ্র - রাজ্য বিতর্ক : সারকারিয়া কমিশন

১৯৬৭সাল থেকে কেন্দর্র রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের যে দাবি ওঠে তা ১৯৮৩ সালে সমগ্র ভারতকে উত্তাল করে তোলে। পাশাপশি শাসক গোষ্ঠীর জনসমর্থন হ্রাস পেতে থাকে। এরকম অবস্থায় জনমতের চাপে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৩ সালের ২৪শে মার্চ কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্ক খতিয়ে দেখার জন্য ও সদস্যের সারকারিয়া কমিশন গঠন করেন। আর. এস. সারকিয়া ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি।

প্রথমে সারকারিয়া কমিশনবের এক্তিয়ার হিসেবে ঘোষিত হয় যে, বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই কমিশন কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কের কার্যগত দিকটি পর্যালোচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেবে। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানালে ১৯৮৩ সালের ৭জুন সারকারিয়া কমিশনকে সুপারিশ করার ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সারকারিয়া কমিশনের পক্ষে বলা হয় কেন্দ্র রাজ্যের অর্থিক সম্পর্কের পর্যালোচনাকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হবে। কারন রাজস্ব বন্টনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। এছাড়া, আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বন্টন, রাজ্যপালের ভূমিকা, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ, আন্তঃরাজ্য পরিষদ, পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও কেন্দ্র কতৃক রাজ্যগুলিকে নির্দেশদান প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন পরীক্ষা নিরিক্ষা করে সুপারিশ জানাবে।

টিপ্পনী

সারকারিয়া কমিশন উপরে বর্নিত বিষয়ে একটি প্রশ্নমালা রচনা করে প্রতিটি রাজ্যে ও ভারত প্রশাসন সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রেরন করে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৮৭ সালে দীর্ঘ ৪বছর পরে দুখন্ডে রচিত ৪৪০০ পাতার এক বৃহৎ প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে কর বন্টনের পুনর্বিন্যাস, আঞ্চলিক পরিষদের ভূমিকা, জাতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন পরিষদ, রাজ্যপালের নিয়োগ, ৩৫৬ ধারা ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা, সর্বভারতীয় চাকরি, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পরামর্শ মেলে।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদনের সুদীর্ঘ ৪ বছর ধরে নানা আলোচনা ও পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত রূপ পেলে এই প্রতিবেদন দেখে অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছেন। কারণ অনেকেই আশা করেছিলেন ভারতে কেন্দ্রীকরনের অতি প্রবণতা হ্রাস পাবে, রাজ্য গুলির সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে ইতিবাচক সুপারিশ থাকবে এবং তুলনামূলকভাবে রাজ্যগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কিন্ত কমিশন এব্যাপারে কোন সুপারিশ করেনি। তাই সারকারিয়া কমিশন কেন্দ্র - রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যসের ক্ষেত্রে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেনি বলেই সাধারন মানুষেরা মনে করেন।

২.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে কী?

(২) সারকারিয়া কমিশ স্পর্কে তীকা লেখ?

(৩) আন্তঃরাজ্য পরিষদ কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন বিষয়ে আলোচনা কর।

(২) কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনগত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

(৩) কেন্দ্র - রাজ্যের অর্থিক ক্ষমতা বন্টন সম্পর্কে আলোচনা কর।

২.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) কল্যাণকুমার সরকার, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" শ্রীভুমি, কলকাতা

২০১০।

(২) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্রম, কলকাতা - ২০১০

(৩) অনাদি কুমার মহাপাত্র, "আরতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনিতি" প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(8) S. L. Sikri, " Indian Govermment and Politics," Kalyani Publisher, New Delhi, 1997

(৫) M. V. Pylee, "Indian Government and Politics" Asia Publishing House, New Delhi, 1999

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংবিধান সংশোধন

টিপ্পনী

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - সংবিধান সংশোধনের অর্থ

৩.৩ - সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ও ভারত

৩.৪ - সংবিধান সংশোধনের মূল্যায়ন

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভূমিকা

সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। এই আইনে দেশ ও সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় । সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানের পরিবর্তন ও কাম্য । জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "যদি সংবিধান থেমে থাকে তাহলে তা মৃত দলিলে পর্যবসিত হয় ।" স্বভাবতই ১৯৪৯ সাসলের ২৬ শে নভেম্বর গণপরিষদ যে সংবিধান গ্রহন করেছিল, আজ তা এক জায়গাব থেমে নেই । ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ৯৪ বার সংবিধান সংশোধন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

সংবিধান সভায় বিতর্ক কাললে বহু সংবিধান প্রণেতা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবিধান পরিবর্তনের দাবী জানান। অন্যতম সংবিধান প্রণেতা পি. এস. দেশমুখ তাই বলেন "If you do not Provide the useful outlets or sefty vales for theair or the storms to pass through , it is likely that the whole ship might be blown up." তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় তা প্রকৃতগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় । যুক্তরাস্ট্রীয় সংবিধান যদি দুস্পরিবর্তনীয় না হয় তাহলে অঙ্গরাজ্যগুলি সর্বদা অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভুগবে। তাই সংবিধান প্রণেতারা সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভারসাম্য বজায়

রাখার জন্য সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিতে দুস্পরিবর্তনীয়তার সঙ্গে নমনীয়তার সংমিশ্রন ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৩.২ সংবিধান সংশোধনের অর্থ

টিপ্পনী

সাধারন অর্থে সংশোধন করা হল উন্নতি বিধান করা। কিন্তু সংবিধানের প্রেক্ষাপট যখন সংশোধন করার কথা বলা হয় তখন তা স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। সংবিধানের কোনো অংশ বা অংশ সমূহের পরিবর্তন, সংযোজন বা বর্জনকে তাই সংইধান সংশোধন বলা হয়। অনেকে সংবিধান সংশোধনকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। তাদের মতে সংবিধানের যে কোনো অংশের পরিবর্তনকেই সংবিধান সংশোধন বলা হয়। যেমন হারম্যান ফাইনার ববলেন, "Our constitution : Defaced and Defiled' গ্রন্থে সংবিধান সংশোধনের এক গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধন হল সংবিধানের উন্নতি বা অধিক ভালো করা তথাএর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করা ; সেই ধরনের পরিবর্তন করা যার ফলে মূল সংবিধানের উৎকর্ষ বিধান না হলেও তার মৌলিক বৈশিষ্টগুলি অক্ষুন্ন থাকে বা সংবিধানের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন।

তবে মনে রাখা দরকার সংবিধান সংশোধন মূলত আইনের বিষয় হলেও এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শাসক শ্রেনীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। উদাহরন স্বরূপ বলা যা, শাসকগোষ্ঠী যাতে ক্ষমতাসীন থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। বিগত প্রায় ৬৭ বছরে ভারতে ১০০বারের বেশী সবিধান সংশোধন হলেও 'সকলের কাজের অধিকার' আজও সংবিধানের সংযোজিত হয়নি।

৩.৩ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ও ভারত

আধুনিক সংবিধানের শ্রেনীবিভাজনের অন্যতম ভিত্তি। সংবিধান সংশোধনের প্রকৃতি লর্ড ব্রাইস সেই কারনেই সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান গুলিকে দু''ভাগে বিভক্ত করেছেন - সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয়।

যে সংবিধান সাধারন আইন প্রনয়নের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ

সহজেই পরিবর্তন করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible Constitution) বলে। এই ধরনের সংবিধানের ধারনা গুলি পরিবর্তনের জন্য কোনো বিশেষপদ্ধতি অনুসরন করা হয় না। ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যদিকে যে সংবিধান সাধারন আইন প্রনয়নের পদ্ধতিতে পরিবর্তিত না হয়েও বিশেষ এক জটিল পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়, তাকে দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Rigid Constitution) বলা হয়। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান দেখা যায়।

টিপ্পনী

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পক্ষ যারা সওয়াল করেন তাঁরা বলেন যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের উপযোগী ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সুপরিবর্তনীয় সংবিধান অধিক কাম্য। কারণ যথাযথ ভাবে চাহিদা পূরণ না হলে দেশে বিপ্লব দেখা দিতে পারে। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় রায় দান কালে বিচাপতি খান্না বলেন "সংবিধান সংশোধন করার সহজ ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের মত সংবিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এছাড়া, রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যও সংবিধান পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে।' যেমন - ১৯৭১ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয় করনের জন্য সংবিধান পরিবর্তন জরুরি ছিল। আবার দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সমর্থকরা বলেন, সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন, তাকে সহজে পরিবর্তন করা হলে শাসক শ্রেনী নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জনস্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে। ভারতে ৪২তম সংবিধান সংশোধন হল এ ধরনের ঘটনার অন্যতম নিদর্শন। তবে যে সমস্ত দেশে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকে সেখানে সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় না হলে কেন্দ্রীয় সরকার সহজেই তার ক্ষমতা বিস্তার করে রাজ্যগুলিকে ক্ষমতাহীন করে তুলতে পারে।

ভারতীয় সংবিধান প্রনেতাগণ সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট চেতন ছিলেন। জওহরলাল নেহরু, বি. আর. আম্বেদকর প্রমুখ নেতৃববৃন্দ বলেন যে আমরা সংবিধানকে এমন দুস্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তুলতে চাই না যা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হবে না। কারন সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় হলে জাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। বাস্তবে সংবিধান চূড়ান্ত বা অভ্রান্ত নয় এর মধ্যে নমনীয়তা থাকা উচিত এবং সংবিধান হবে সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সংমিশ্রন। ভারতীয় সংবিধানে এই বক্তব্যের প্রতিফলন মেলে।

টিপ্পনী

৩৬৮ ধারা (Article 368)

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি মূলত ৩৬৮ নম্বর ধারায় বিস্তারিত ব্যক্ত হয়েছে। ৩৬৮ ধারাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল -

(ক) পার্লামেন্ট তার ক্ষমতা বলে সংবিধানে যা কিছু আছে তার সংযোজন, পরিবর্তন করতে পারে এই ধারা অনুসারে।

(খ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র সংসদের যে কোনো কক্ষে হতে পারে এবং প্রত্যেক কক্ষে সে কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটদানকারী কতৃক এ বিল গৃহিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হবে এবং তিনি বিলে সম্মতি দিল ঐ বিল অনুসারে সংবিধান সংশোধিত হবে।

(গ) ১৩ নম্বর ধারায় কোনো কিছুই এই ধারা দ্বারা সংশোধিত হবে না।

(ঘ) সংবিধানের তৃতীয় অংশ সহ সংবিধানের যেকোনো অংশের সংশোধন করা হলে যে সম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্ন পত্র তোলা যাবেনা (৪২তম সংবিধান সংশোধন)

(ঙ) এই ধারা অনুযায়ী সংবিধানের ধারাসমূহের সংযোজন পরিবর্তন বা নিরসনের ক্ষমতা সংসদের রয়েছে। তার কোনো প্রকার সীমা থাকবে না (৪২তম সংবিধান সংশোধন)।

৩৬৮ ধারাকে পর্যালোচনা করলে সংবিধান সংশোধনে যে সমস্ত উপাদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল -

(১) বিল উত্থাপন

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল সংসদের যেকোনো কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং তা মন্ত্রী বা যে কোনো সদস্য উত্থাপন করতে পারে তবে অর্থসংক্রান্ত কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল হলে তা কেবল লোকসভায় উত্থাপন করা যায়। আবার সংবিধানের ৩নম্বর ধারা অনুসারে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যসমূহের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে হয়, তবে অনুমোদন না

পেলে এই সংশোধনী কার্যকর হয়।

(২) সংসদের ভূমিকা

কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ এককভাবেই রাষ্ট্রপতির সাহায্যে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। রাজ্য আইনসভার এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। ভারতের রাজ্য আইনসভাগুলি স্বতন্ত্রভাবে কোনো বিল উত্থাপন করতে পারে না।

টিপ্পনী

(৩) উভয়কক্ষই সমক্ষমতা সম্পন্ন

সংবিধান সংক্রান্ত সংশোধনী বিল উভয় কক্ষেই নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত হতে হয়। তবে যদি এক কক্ষ অনুমোদন করে এবং অন্যকক্ষ প্রত্যাখান করে তাহলে তা কার্যকর হয়ে যায়। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলকে কেন্দ্র করে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে যৌথ অধিবেশন আহ্বান করার কোনো সংস্থান নেই।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের দুধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়, যেমন - মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ভোটদানকারীদের দুই - তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা । তবে কোনো সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে অনুমোদিত হবার পর রাজ্য আইনসভা দ্বারা অণুমোদিত হতে হয় । অর্ধেকের বেশি রাজ্য আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থিত করলে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য । সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতির ভোটে ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই ।

সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলার রায় দান কালে ৩৬৮ ধারায় যেসব ক্ষেত্রে অস্পস্টতা ছিল তা অনেকটাই পূরন করে দিয়েছে। গোলকনাথ মামলা, শংকরী প্রসাদ মামলা, মিনার্ভা মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় স্পষ্ট হয়েছে যে পার্লামেন্ট শুধু ১৩(২) ধারাই নয় ; সংবিধানের মৌল কাঠামো পরিবর্তনে অপারগ এবং আদালতের বিচারযোগ্য।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

ভারতীয় সংবিধান তিনভাবে সংশোধিত হতে পারে অর্থাৎ কেবল

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদ কতৃক একক ভাবে সংবিধান সংশোধন, বিশেষ গরিষ্ঠতার ভোটে সংসদ কতৃক এককভাবে সংবিধান সংবিধান এবং কেন্দ্রীয় আইন সভা ও রাজ্য আইসভা দ্বারা যৌথভাবে সংবিধান সংশোধন।

টিপ্পনী

প্রথম পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধনের প্রথম পদ্ধতি অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের এমন কতগুলি ধারা আছে যেগুলি সংশোধন বা পরিবর্তন করার জন্য পার্লামেন্টের শুধু সাখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাগে অর্থাৎ সাধারন বিল পাশের পদ্ধতির মতো সংবিধান সংক্রান্ত বিলটিকে পাশ করা যায় । এরজন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি তথা ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা রাজ্য আইনসভার অণুমোদন লাগে না। পার্লামেন্টে বিলটি পাশ হবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের পর সংশ্লিষ্ট ধারায় পরিবর্তন বা পরিমার্জনা ঘটে। সংবিধান সংক্রান্ত কোনো বিল রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থিত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি বাধ্য থাকেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধনের দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করতে হলে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে মোট সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ভোটাদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এইভাবে কোনো বিল পাশ হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে সংবিধান সংশোধন চূড়ান্ত হয়। সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি এই পদ্ধতিতে সংশোধিত হতে পারে। প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতিতে যে ধারা বা অংশগুলি সংশোধিত হয় না তা এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সংশোধিত হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি

ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের তৃতীয় পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানের যে যে অংশ পরিবর্তিত হয় তা ৩৬৮ ধারায় বিশদভাবেবর্ণিত হয়েছে। যথা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যাকালের মেয়াদ, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের এক্তিয়ার, সংসদে প্রতিনিধিত্ব, সপ্তম তালিকায় পরিবর্তন ও ৩৬৮ ধারায় পরিবর্তন ইত্যাদি এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলকে প্রথমে সংসদের উভয়

কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ও ভোটদানকারী উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন আবশ্যক। এইভাবে অনুমোদিত হবার পর ২৯টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভার কাছে প্রেরিত হয়। অর্থেকের বেশী রাজ্য অর্থাৎ কমপক্ষে ১৫টি রাজ্যের দ্বারা অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা সংবিধান সংশোধন আইন হিসাবে গণ্য হবে।

টিপ্পনী

ভারতে আজ পর্যন্ত এই তিন পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন হয়ে আসছে।

৩.৪ সংবিধান সংশোধনের মূল্যায়ন

ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় সংবিধান প্রনেতাগণ দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিতে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। গত ৬৭ বছরে ১০০ বারের বেশি সংবিধানসংশোধন নিঃসন্দেহে সেই কথাই প্রমাণ করে। সংসদে শাসক গোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে ভারতের সংবিধানে ব্যাপক রদবদলে সক্ষম। যেমন ৪২ তম সাবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। দীর্ঘ ৬৭ বছরে ভারতে সংবিধান যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাতে সংবিধানের ওপরে সাধারন মানুষের আস্থা দিন দিন ক্ষীন হয়ে পড়তে থাকে। দক্ষিন ভারতে তামিলনাড়ু অথবা কাশ্মীরে সংবিধান সংক্রান্ত কোনো বিতর্ক দেখা দিলে 'সংবিধান পোড়ানো' এক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তবে বর্তমান ভারতে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ও অস্থির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সংবিধান সংশোধনের দ্রুত মাত্রা অনেকাংশে প্রতিহত হয়েছে।

৩.৫ অনুশীলনী

প্রশ্নাবলী

(১) সংবিধান সংশোধনের অর্থ কী?

(২) ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি আলোচনা কর?

৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) M.V. Pylee, "Indian Government and politics", Asiapublishing House, New Delhi, 199

(২) S. L. Sikri, "Indian Government and Politics", Kalyani Publisher, new Dellhi, 1997

(৩) অনাদি কুমার মহাপাত্র, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি", প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০১২.

(৪) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্রম, কলকাতা, ২০১০

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও রাজ্যের শাসন বিভাগ

টিপ্পনী

১.১ - ভূমিকা

১.২ কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ

১.২.১ - রাষ্ট্রপতি

১.২.২ - প্রধানমন্ত্রী

১.৩ - রাজ্যের শাসন বিভাগ

১.৩.১ - রাজ্যপাল

১.৩.২ - মুখ্যমন্ত্রী

১.৪ - কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ

১.৫ - রাজ্য মন্ত্রী পরিষদ

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ - ভূমিকা

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসনবিভাগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন। ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহন করায় কেন্দ্র ও রাজ্যে দু'জন করে শাসক বর্তমান - নাম সর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি 'নামসর্বস্ব শাসক' এবং প্রধানমন্ত্রী 'প্রকৃত শাসক'। তবে রাষ্ট্রপতির নামেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক হলেও পূর্বের মত ব্যাপক ক্ষমতাধর নন। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান এবং জোট সরকারের আর্বিভাবের ফলে প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতিগত ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই প্রায়শই প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচকরা 'Role back Prime Minister' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। অনুরূপভাবে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যপাল 'নামসর্বস্ব শাসক' এবং মুখ্যমন্ত্রী 'প্রকৃত শাসক'।

তবে পৃথিবীর অন্যান্য মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত সরকারের ন্যায় ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই প্রকারের রাজনৈতিক শাসনবিভাগ ছাড়া অরাজনৈতিক শাসন বিভাগ রয়েছে। এঁরা হলেন সরকারি কর্মচারিবৃন্দ যারা আমলা নামে পরিচিত।

টিপ্পনী

১.২ কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (The central Executive)

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারত সংবিধানের রূপরেখা চিন্তা করলেও রাষ্ট্রপ্রধান তথা কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রকৃতি কীরূপ হবে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ পাননি। ফলে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হলে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রকৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এই আলোচনায় সুইস মডেল, মার্কিন মডেল ও ব্রিটিশ মডেল আলোচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতে ব্রিটেনের মতো মন্ত্রীপরিষদচালিত সরকার এবং রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদ বেছে নেন। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ ও সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠনের কথা ও বলা হয়।

১.২.১ ভারতের রাষ্ট্রপতি (The President of India)

ভারতের সংবিধানের ৫২ নম্বর ধারায় ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের কথা ঘোষিত হয় ("There shall be a preident of India") তিনি শাসন বিভাগের প্রধান, তাঁর নামে দেশ শাসিত হয়। তিনিই হলেন ভারতের প্রথম নাগরিক, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি দেশে বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এককথায় তিনি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে সমাসীন। কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। অর্থাঃ প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতের প্রকৃত শাসক এবং স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বা নামসর্বস্ব শাসক। খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ বি. আর. আম্বেদকর বলেন, "ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু শাসক প্রধান নন"। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের পর এটা আরোও স্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে কারণ - রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মানতে বাধ্য।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা (Qualifications for the Presidency)

সংইধানের ৫৮নম্বর ধারায় বলা আছে রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাঁকে ভারতের

নাগরিক হতে হবে, ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি পদপার্থী কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো সরকারি কর্মচারী হবেন না। এমনকি মন্ত্রী থাকলে ও তাকে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে। সংবিধানের ৫৯ নম্বর ধারায় বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা সংসদ ও রাজ্য আইনসভার কোনো কক্ষের সদস্য থাকতে পারেন না। যদি কোনো সাংসদ বা বিধায়ক রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন তাহলে ঐদিন থেকে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি সাংসদ বা বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া, রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার পূর্বে ১৯৯৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন অনুসারে দুটি শর্ত পালন করতে হয় - রাষ্ট্রপদি পদ প্রার্থীকে ১৫,০০০ টাকা জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে এবং প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা প্রস্তাবিত ও ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা সমর্থিত হতে হয়।

টিপ্পনী

নির্বাচন পদ্ধতি

জাতিয় নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে জাতীয় ও নিরপেক্ষ চরিত্র প্রদানের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৫৪নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি একটি নির্বাচক মন্ডলীর দ্বারা পরোক্ষে নির্বাচিত হন এবং এই নির্বাচক মন্ডলী গঠিতহয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে প্রধানত দুটি নীতি অনুসরন করা হয়-

এক- বিভিন্ন রজ্যের বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যা এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যার মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়।

দুই - নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হবে। তবে মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী না পেলে কোনো প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন না।

উপরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে - একক হস্তান্তর যোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক বা প্রতিনিধিত্ব। সংবিধানের ৫৪ ও ৫৫ নম্বর ধারায় এই পদ্ধতিকে কার্যকারী করার জন্য কতকগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

টিপ্পনী

প্রথম পর্যায়ে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারন করা হয়। প্রত্যেক সদস্যদের ভোট একটি হলেও ভোটের মূল্য সবক্ষেত্রে সমান হয়। এই মূল্য নির্ধারনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যে জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় এবং এই ভাগমালাকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করা হয় এবং এই ভাগফলের যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাই হবে ঐ রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। তবে দ্বিতীয়বার ভাগের সময় ভাগশেষ যদি ৫০০ আ তার বেশী ব তবে ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হবে।

দ্বিতিয় পর্যায়ে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে নির্বাচিত সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারন করা হয়। সকল অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে মোট যত ভোট দেন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ঠিক ততগুলি ভোট দেন। তাই পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এইভাবে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই হলো পপ্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। তবে ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেকের সমান বা তার বেশী হয় তাহলে ভাগফলেরসঙ্গে এক যোগ করতে হবে।

একটি কাল্পনিক উদাহরনের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতেপারে। ধরা যাক ত্রিপুরায় জনসংখ্যা ২,৫০,০০,০০০ এবং ত্রিপুরার নির্বাচিত বিধানসভার সংখ্যা ২৫০। ত্রিপুরার জনসংখ্যাকে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল দাড়ায় ১,০০,০০ লক্ষ। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে ১০০। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রত্যেক সদস্যের ভোটমূল্য ১০০। এখন ত্রিপুরার বিধাসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৫০ হওয়ায় মোট ভোট সংখ্যা হবে ২৫০ X ১০০ = ২৫,০০০। এরপর ভারতের সব রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সব সদস্যের মোট ভোটসংখ্যা নির্ধারন করা হয় এবং পার্লামেন্টের মোট সদস্য দিয়ে ঐ সংখ্যাটিকে ভাগ করে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারন করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হলো ভোটগ্রহন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুযায়ী গোপন ব্যলটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যতজন নির্বাচন প্রার্থী থাকে প্রত্যেক ভোটদাতা ততগুলি পচ্ছন্দ জানাতে পারেন। ভোটদাতাগণ

ব্যলটপত্র পচ্ছন্দঅনুযায়ী নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা বসান। প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রথম পছন্দ জানাতেই হয় নাহলে ভোট বাতিল হয়ে যায়।

ভোটগ্রহনের পর সকল নির্বাচন প্রার্থীর প্রথম পছন্দের বৈধ ভোট গুলি গণনা করা হয়। প্রথমে প্রথম পছন্দের বৈধ ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কোটা বলে। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে হলে এই কোটা পেতেই হব। প্রথম গণনার কোনো প্রার্থী যদি কোটা না পান তাহলে যে প্রার্থী সবথেকে কম ভোট পেয়েছেন তাকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তার ব্যালটপত্রের দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই প্রার্থী বাতিল ও ভোট হস্তান্তর চলতে থাকে যতক্ষন না কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ৫বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ভারতীয় রাষ্ট্রপতিদের দু'বারের বেশী নির্বাচনে বাধা নেই। কার্যভার গ্রহনের পর থেকে ৫ বছর তিনি ঐ পদে বহাল থাকলেন। তবে কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। এছাড়া কার্যকাল শেষ হার আগে তাঁর মৃত্যু হলেও রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে তাঁকে পদচ্যুত করবার জন্য ইমপিচমেন্ট বা অভিযুক্তকরন পদ্ধতির কথা বলা আছে। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সাময়িকভাবে উপরাষ্ট্রপতি ঐ পদের আসীন হন এবং ৬মাস পর্যন্ত ঐ পদে সমাসীন থাকেন। কারন ৬মাসের মধ্যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতেই হবে।

রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা

রাষ্ট্রপতি যাতে নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা স্থির করে দেবার ক্ষমতা সংসদের। ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতির বেতন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১,৫০,০০০ টাকা এবং অবসরকালীন ভাতা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা এবং বাড়ি ইত্যাদির সুযোগ তো আছেই।

রাষ্ট্রপতির শপথগ্রহন

সংবিধানের ৬০ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহনের পূর্বে

টিপ্পনী

তাঁকে শপথ গ্রহন করতে হবে। সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির কাচে শপথবাক্য পাঠ করে দায়িত্বভার গ্রহন করেন। প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে তিনি কোনো প্রবীন বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহন করতে পারেন। তাঁকে ঘোষনা করতে হয় যে সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করা ও দেশের জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও কার্যাবলী

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ন্যাস্ত করা হয়েছে, সেগুলিকে প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন - শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থিক ক্ষমতা এবং জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে সমস্ত শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে বা অধস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন। এছাড়া ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, র্নিাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছাড়াও অঙ্গ রাজ্যগুলির রাজ্যপালদের তিনি নিযুক্ত করেন। তিনি এইসব অধিকারকদের পদচ্যুত ও করতে পারেন, তবে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল প্রভৃতি ব্যাক্তিদের অপসারনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের পদচ্যুত করার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীমকোর্টের কোনো বিচারপতিকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করাতে হয়, রাষ্ট্রপতি সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির ও প্রধান। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি যুদ্ধ ঘোষনা বা শান্তি স্থাপন ও করতে পারেন। তবে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতির এইসব সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় না।

(২) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও অত্যন্ত ব্যাপক। সংবিধানের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও সংসদের দুটি কথা নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন অধিবেশন মূলতবি রাখতে পারেন এবং প্রয়োজনে লোকসভা ভেঙ্গে দিতে ও পারেন। তবে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষনা ও পরবর্তী অধিবেশন শুরুর মধ্যে মেন ৬ মাসের বেশী ব্যবধান না থাকে। প্রতি বছর পার্লামেন্টের প্রথম অধিনবেশন শুরু হওয়ার আগে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে তিনি ভাষন দেন। যৌথ সভায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষনের পর সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। এছাড়া কোন বিল বা অন্য কোন বিষয়ে সংসদে তিনি বানী প্রেরন করতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন এবং তা আইনের মতই কার্যকারী হয়। এছাড়া সংসদের কোন সদস্য সদস্যপদের যোগ্যতা হারিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের মতামত গ্রহন করে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।

সংবিধানের ৮০(৩) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা, চারুকলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১২ জন বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনিত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি স্বরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থিক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে আনুমানিক আয়-ব্যায়ের একটি বিবরনী বা বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন ব্যায় মঞ্জুরীর দাবী পার্লামেন্টে পেশ করা যাবে না। কর ধার্য, ঋন-গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হয়। এছাড়া আকস্মিক তহবিল আছে যা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি থেকে আদায়কৃত রাজস্ব বন্টনের সুপারিশ করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশগুলি তিনি পার্লামেন্টে পেশ করেন।

টিপ্পনী

(৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা

ফৌজদারি মামলায় দন্ডিত ব্যাক্তিদের দন্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন বা দন্ডিত ব্যাক্তিকে ক্ষমা করতে পারেন। এছাড়া মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ব্যাক্তির মৃত্যুদন্ড রদ করে তিনি অন্য দন্ড দিতে পারেন। সামরিক আদালত কতৃক শাস্তিপ্রাপ্ত বা দন্ডিত কোন ব্যাক্তি, যেখানে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের এক্তিয়ার ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে প্রনীত আইন লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংকটপূর্ন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে কোন সরকারে হাতেই বিশেষ ক্ষমতা থাকে । ভারতের সংবিধান রচয়িতারা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির হাতে কিছু জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

প্রথমত - সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী যুদ্ধ, বহিঃআক্রমন আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে সমগ্র ভারতে বা তার কোন অংশে নিরাপত্তা বিপন্ন হলে রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন অবস্থা বা জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। একে জাতীয় জরুরী অবস্থা বলে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের যে কোন অংশের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত - সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের মাধ্যমে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না তবে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষনা করতে পারেন, একে রাষ্ট্রপতি শাসন ও বলা হয়।

তৃতীয়ত - সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক কারনেও রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন।রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারত বা তার কোন অংশে অর্থিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি অর্থিক জরিরী অবস্থা ঘোষনা করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির প্রকৃত ভূমিকা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা নেই। তাই এ বিষয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। গণপরিষদে সংবিধান প্রনয়নের প্রাক্কালে বলা হয়েছিল যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মত নিয়ম তান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করবে। যাইহোক রাষ্ট্রপতি 'নিয়মতান্ত্রিক শাসক' না 'প্রকৃত শাসক' - তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক

যদিও রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয় কিন্তু মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির কী পরামর্শ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আদালত কোন অনুসন্ধান করতে পারে না। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে রাষ্ট্রপতির কি শাস্তি হবে তারও সংবিধানে কোনো উল্লেখ নেই । সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা থাকলেও এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা মন্ত্রীসভায় নাও থাকতে পারে। এছাড়া সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি যদি লোকসভা ভেঙে দেন তবে তা রোধ করার কোনো ব্যবস্থা সংবিধানে নেই । তাছাড়া পার্লামেন্টের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা, লোকসভার সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে প্রধানমন্ত্রী মনোনিত করা, দলীয়নেতৃত্ব হারালে প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন, তদারকি মন্ত্রীসভা গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির নিজস্ব এক্তিয়ারের বিষয়। এইসব কারনে কে. এম. মুনসি প্রমুখ সংবিধান প্রণেতাগণ রাষ্ট্রপতিকে স্বাধীন ক্ষমতা ও কতৃত্বসহ একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্বশাসক

তবে অনেক বাস্তববাদী সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন মত পোষন করে থাকেন। তাঁদের মতে ভারতে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন সংসদের কাছে দায়িত্বশীল এক মন্ত্রী পরিষদ। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই মন্ত্রীসভায় পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। মন্ত্রীপরিষদের কার্যকাল তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্ঠি বা আস্থার ওপর নির্ভরশীলহলেও লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দলের মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা সম্ভব নয়। ৪২ ও ৪৩ তম

টিপ্পনী

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে চূড়ান্তভাবে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। ডঃ বি. আর আম্বেদকর বলেছিলেন, ব্রিটিশ সংবিধানে রাজশক্তির যে মর্যাদা ভারতের রাষ্ট্রপতির ও সেই মর্যাদা। তিনি জাতির প্রধান কিন্তু শাসন বিভাগের প্রধান নয়।

সুতরাং বলা যায় কেন্দ্রে যদি লোক সভার কাছে আস্থাশীল একটি মন্ত্রীসভা থাকে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থেকে তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক কিন্তু পরিস্থিত যদি অন্যরকম হয় তখনই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভবনা। ১০৭৯ সালে মোরারজি দেশাইয়ের পতনের পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির বা ১৯৯০ সালের বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংএর মন্ত্রীসভা পতনের পর রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কাটরামনের ভূমিকা এই ঘটনারই স্বাক্ষর বহন করে। তবে রাষ্ট্রপতির ব্যাক্তিত্বর, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব - প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ব্যাক্তিগতও রাজনৈতিক সমর্থক রাষ্ট্রপতির প্রকৃত শাসক হয়ে উঠতে পারা না পারার ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকারী।

১.২.২ প্রধানমন্ত্রী(The prime Minister of India)

ভারতের গণপরিষদের ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অনুকরনে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার ফলস্বরূপ ভারতে মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। পৃথিবির অন্যান্য মন্ত্রী পরিষদ চালিত সরকারের মত ভারতেও প্রধানমন্ত্রী শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই হলেন বেজ হটের (Begehot)) ভাষায় "ক্যাবিনেট সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর" (Keystone of the cabinet arch)। তাঁকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলী বাস্তবায়িত হয়। তবে ধীরে ধীরে গত ছয় দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে যেভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতেভারতে সরকারকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার" (Prime Ministerial Form of Government) বললে কোন অত্যুক্তি হয় না।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

সংবিধানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কেবিশেষ কিছু বলা নেই। শুধু ৭৫ নম্বর ধারায় বলা আছে "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হবেন" (The Prime Minister

Shall be appointed by the President) আর ৭৫(৩) ধারায় বলা আছে "মন্ত্রী পরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকবে" (The council of Minister shall be collectively responsibly to the House of the People) সাধারন নিবাচনের পর যে দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহনের জন্য আহ্বান করা হয়।

টিপ্পনী

বেতন ও ভাতা

ভারতের মূল সংবিধানের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত হারে প্রধানমন্ত্রী বেতন ও ভাতা পাবেন বলেস্থির। তবে এও বলা হয় যে, এই হারে ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন না সংসদ আইন প্রনয়ন করে নতুন বেতন হার নির্ধারন করে। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের থেকে মাসিক ১০০০ টাকা বেশী বেতন পান। এছাড়া অন্যান্য ভাতা, বাড়ি ভাড়া, মালি, দারোয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি পেয়ে থাকেন এবং গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহারের সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

কার্যকাল

সাধারনভাবে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে লোকসভা আগে ভেঙে গেলে বা জরুরী অবস্থা ঘোষনার ফলে লোকসভার মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের হ্রাস - বৃদ্ধি ঘটে।প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের মেয়াদ লোকসভার মেয়াদের সমান। ভারতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দু'দফায় মোট ১৫বছর প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা

সংবিধানের বলা আছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্রৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা ভোগ করেন তা সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর যথাযথ ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে উপলব্ধি করতে হলে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। যেমন -

(১) রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

সংবিধানের ৭৪(১)ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে এবং সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারায় বলা আছে

টিপ্পনী

প্রধানমন্ত্রী শাসন ও আইন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব শাসক প্রধান, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী তাঁর নামে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাষ্ট্রপতির বোঝাপড়া যত সুসংহত হবে প্রধানমন্ত্রীর তত সহজে তার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন করতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের বোঝাপড়া এক না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দুজনের ভূমিকার ফারাক দেখা দেয়।

(২) মন্ত্রী পরিষদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যে সব দায়িত্ব পালন করেন সেগুলি হল - মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকেপরামর্শদান এবং সংবিধানের ৭৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীসভার নেতা। তাঁর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। মন্ত্রীসভার পুর্নগঠন, দপ্তর পুনবন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিরাগভাজন যে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন বা রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করাতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষন ও নিজের সম্পূর্ন আস্থাভাজন কয়েকজন মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করেন - এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(৩) দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হন। তিনি কীভাবে সরকার পরিচালনা করেন, দলীয় প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন, সরকারী কর্মসূচীকে কতটা জনপ্রিয় করতে পারেনতার ওপর ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। দলের শক্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব ও মর্যাদার ওপর। পরবর্তী নির্বাচনে যাতে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তার ব্যাক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা প্রভৃতিকে মূলধন করে সক্রিয় ভূমিকাগ্রহন করেন।

(৪) সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সংসদের মূল নায়ক। তিনিই সরকারী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য নির্ভর করে। তাঁর দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ওপর। তবে সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে নানা দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন সংসদে সরকারের কার্যক্রম ও নীতি যথাযথভাবে তুলে ধরা, গৃহীত নীতির ব্যাখ্যা করা, দলীয় সদস্যের আচরন নিয়ন্ত্রন করা, সংসদের সদস্যদের সুযোগ সুবিধা বিতরন করা সংসদের বিতর্কে যোগদান করা এবং দলীয় কর্মী বিতর্কে জড়ালে উদ্ধার করা ইত্যাদি। সুতরাং সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

(৫) জননেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

দেশের প্রকৃত প্রশাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যাস্ত হওয়ায় জননায়ক হিসেবেও তিনি স্বীকৃত। বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন, প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রচার লাভ করে। ফলে জনগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আগ্রহ ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। সরকারের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অনেকাংশে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার ওপর নির্ভরকরে। দেশের বিভিন্ন সংকটের সময় জাতির নেতা হিসেবে নেতৃত্বদানের ক্ষমতার ওপর প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(৬) আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহেরুর আমল থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেআসছেন। প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকাথাকে । ভারতের প্রধানমন্ত্রীজোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করেন তাহলে দেশের যে সমস্ত ছোটোখাটো বৈদেশিক সমস্যা আছে তা সহজেই অতিক্রম করতে পারেন। তাসখন্দ চুক্তি, বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি, সিমলা চুক্তির ন্যায় চুক্তি তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রীরাই করেছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা শুধুমাত্র সংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। ব্যাক্তিত্ব, দূরদর্শিতা, দলের ওপর নিয়ন্ত্রন, প্রতিদ্বন্দীর অনুপস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে প্রসারিত করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী পদের মূল্যায়ন করলে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যাব। একদিকে কয়েক জন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান, অন্যদিকে একদল প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সহজেই নজরে পড়ে। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রথম শ্রেনীভুক্ত আর দ্বিতীয় শ্রেনীতে পড়েন মোরারাজি দেশাই, চরন সিং, চন্দ্রশেখর, ভি, পি. সিংপ্রমুখ।

বস্তুত একই হস্তে প্রধানমন্ত্রীত্ব ও দলের সভাপতিত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের অবস্থিতি, সংবিধান সংশোধনের সহজ সুযোগ, প্রধানমন্ত্রী পদের রাষ্ট্রপতিকরন প্রয়াস, অর্থ সামাজিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর পদকে যেমন মর্যাদাসম্পন্ন করেছে, পাশাপাশি তেমনি দলীয় কোন্দল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস, সম্মিলিত সরকার গঠন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ততা মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পন, আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের চাপে বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশ অনুমোদন প্রভৃতি কারনে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পদকে কাজে লাগাবেন সেরকম পদমর্যাদা তিনি করতে সক্ষম হবেন।

১.৩ রাজ্যের শাসন বিভাগ

সবভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি ভারতের রাজ্যগুলিতে বিদ্যমান। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মতো রাজ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের দেখা যায়। তুলনামূলক বিচারে রাজ্যপালের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থেকে বেশী। কারণ জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনভার গ্রহন করেন। এছাড়া, রাজ্যপাললের স্বেচ্ছাধিন ক্ষমতা আছে কিন্তু রাষ্ট্রপতির তা নেই। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তাঁর পরামর্শে রাজ্যপাল তাঁর ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই রাজনীতিতে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্তমান।

১.৩.১ রাজ্যপাল

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্যপালরা হলেন রাজ্যের প্রধান,

তাঁদের নামে রাজ্য শাসিত হয়। জে. সি. জোহারি তাই বলেন "The Governor is the constitution head of the state Government in formal sense in real sense, he is an agent or a representative of the center. সংবিধানের ১৫৩নং ধারা অনুসারে প্রতিটি রাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকবে। তবে একাধিক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপপালকেও দায়িত্ব গ্রহন করতে দেখা যায়। যেমন রাজ্যপাল এল. পি. সিং বা বি. কে. নেহরু একদা একসঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্য, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার রাজ্যপাল ছিলেন।

টিপ্পনী

নিয়োগ

সংবিধানের ১৫৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় রাজ্যপালকে নিয়োগ করার সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়ার একটি সুস্থ নীতি গড়ে উঠেছে। তবে মাঝে মাঝে এই রীতিতে ব্যাতিক্রম ও লক্ষ্য করা যায়। রাজ্যপাল নিয়োগের আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে আলোচনা করেই রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকেন। তবে সাধারণত ভারতের অখন্ডতার কথা মনে রেখে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসীদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হয় না।

যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতির মত রাজ্যপালকে ভারতের নাগরিক ও ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হয়। তিনি কোনো সরকারী কর্মচারী হবেন না। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার বা রাজ্য আইনসভার কোনো কক্ষের সদস্য হতে পারবেন না। সদস্য হয়ে থাকলে রাজ্যপাল পদে নিযুক্তির পূর্বে সেই সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়। রাজ্যপালের নিয়োগ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নিয়োগ। তাই নিয়োগের সময় কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন রাজনৈতিক দিক থেকে শাসকদলের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শিক্ষাবিদ, আমলা, শিল্পপতি, সামরিক বিভাগের প্রাক্তন পদস্থ কর্মী, প্রাক্তন মন্ত্রী, সক্রিয় রাজনৈতিক নেতাই উপযুক্ত।

কার্যকাল

সংবিধানের ১৫৬ নম্বর ধারায় বলা আছে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিধান সাপেক্ষে রাজ্যপাল নিজপদে আসীন থাকেন। তবে সাধারনভাবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ

বছর। যেদিন থেকে তিনি কার্যভার গ্রহন করেন সেদিন থেকেই তাঁর পাঁচ বছর কার্যকাল শুরু হয়।

বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

টিপ্পনী

সংসদ রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা স্থির করে দেয়। বর্তমানে আইন অনুসারে রাজ্যপালের বেতন ১,১০,০০০ টাকা এছাড়া তিনি বাসস্থান সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। ১৫৮(৪) ধারা অনুসারে তাঁর কার্যকালের মধ্যে বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সংবিধানের ১৫৪ ধারা অনুসারে "রাজ্যের শাসন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে নিয়োজিত হবে। সংবিধান অনুসারে তিনি এই ক্ষমতাকে স্বয়ং অথবা অধঃস্তন কর্মচারিদের সহায়তায় রূপায়ন করবেন।" বস্তুত রাজ্যপালের ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত বিশেষ বিতর্ক দেখা দেয়নি। কারণ তখন কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার বিরাজ করত। ১৯৬৭ সালে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে। রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) শাসন বিষয়ক ক্ষমতা

রাজ্যের শাসন বিভাগীয় প্রধান হলেন রাজ্যপাল এবং সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়। তিনি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের কার্যকালের মেয়াদ একদিকে যেমন রাজ্যপালের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল অন্যদিকে মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভায় নিকট দায়িত্বশীল। বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করে ততক্ষন রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদকে বরখাস্ত করতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন ও আইন সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তাবসমূহ রাজ্যপালকে জানাবেন। এছাড়া রাজ্যপাল রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, রাজ্য সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের

বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সাথে পরামর্শ করা থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে যে কোনো মন্ত্রীকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। রাজ্যপাল সকল রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ করেন। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপাল ১৫দিন অন্তর রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যের পরিস্থিতি জানিয়ে প্রতিবেদন পাঠান। কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাজ্যপাল প্রত্যক্ষভাবে শাসন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

টিপ্পনী

(খ) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার সদস্য না হলেও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনে বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। অবশ্য সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য মেনে এ ব্যাপারে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহন করেন। তিনি রাজ আইনসভায় ভাষন দেন অথবা বানী প্রেরন করেন। তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি দিতে পারেন, আবার রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলটিকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। এছাড়া অর্থবিল বাদে অন্যান্য বিলকে পুনরায় বিবেচনার জন তিনি রাজ্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে দ্বিতীয় বার বিলটি গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালও জরুরী আইন জারি করতে পারেন। তবে বিধানসভায় অধিবেশন শুরুর ৬সপ্তাহের মধ্যে আইনসভার কতৃক অনুমোদিত হতে হয়। এছাড়া রাজ্যপাল বিধানসভায় একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন।

(গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া আইনসভায় কোনো ব্যায় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা যাব না, তাঁর অনুমতি ছাড়া কনো অর্থবিল বিধানসভায় পেশ করা যায় না। এছাড়া রাজ্য সরকারের যাবতীয় আয় ব্যায়ের হিসেব রাজ্যপাল রাজেটের আকারে প্রতি অর্থিক বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে বিধানসভায় পেশ করেন। রাজ্যের জরুরী তহবিল ও থাকে রাজ্যপালের তত্ত্বাবধনে। আকস্মিক কোন ব্যায় নির্বাহের জন্য রাজ্য আইনসভায় অণুমোদন ছাড়াই তিনি এই তহবিল থেকে অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।

টিপ্পনী

(ঘ) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারা অনুসারে রাজপালকে কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নন। যেমন আসামের স্বশাসিত উপজাতি অঞ্চলে খনিজ সম্পদের রয়্যালটি নিয়ে জেলা পরিষদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ বাধলে তার মীমাংসার ক্ষেত্রে আসামের রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। নাগাল্যান্ডে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ যতদিন বজায় থাকবে ততদিন ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা থাকবে। এছাড়া সিকিম, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। এগুলি ছাড়া আরো দুটি ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করেন - কোন রাজ্য বিলকে তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটকে রাখতে পারেন এবং রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করতে পারেন। উপজাতিভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান, কোন দলের জোটের পক্ষে সরকার গঠনের সমস্যা দেখা দিলে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে রাজ্যপাল স্ববিবেচনা প্রয়োগ করেন।

রাজ্যপালের পদমর্যাদা

সাধারনভাবে ১৯৫৯ সালের পূর্বে রাজ্যপালের পদমর্যাদা নিয়ে বিশেষ আলোচনার অবকাশ ঘটেনি । কারন ১৯৫৯ পূর্বে কোন রাজ্যপাল সংবিধান প্রনেতাগণের ইচ্ছা মেনে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকার 'লক্ষ্মনরেখা' অতিক্রম করেননি। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর. কে. এম. মুন্সী প্রমুখের বক্তব্যে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনবিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা পালন করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালত মন্ত্রী পরিষদই হবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারি। অর্থাৎরাজ্যপাল মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য পরিচালনায় বাধ্য।

যতদিন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলের সরকার ছিল ততদিন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপালের ভূমিকায় কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারন নির্বাচনের পর অনেকগুলি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যপালের ভূমিকা বিতর্কিত হয়ে ওঠে। সাধারনভাবে

দেশের জ্ঞানী গুনী ব্যাক্তিদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করার প্রয়াস পরিবর্তন করে কেন্দ্র সরকার আস্থাভাজন ব্যাক্তিত্বের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করতে শুরু করে। ফলে এই সব রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তারা কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উৎসাহে নানাভাবে রাজ্যের রাজনীতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। রাজ্যপালদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন, রাজামান্নার কমিটি, সারকারিয়া কমিশন ও রাজ্যপাল কমিটি রাজ্যপালদের কার্য পরিচালনায় বিধি প্রনয়নের সুপারিশ করেছে। কিন্তু সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। এর থেকে সিদ্ধান্ত আসা যায় যে পদমর্যাদার দিক থেকে রাজ্যপালের পদটি "নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের"।

টিপ্পনী

১.৩.২ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতে অঙ্গরাজ্য গুলিতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা থাকায় রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নরম্যান ডি পামারের ভাষায় "রাজ্যগুলিতে প্রকৃত শাসক মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে যাঁর প্রকৃত অবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ" এস. আর. মাহেশ্বরী তাঁর 'State Government in India' গ্রন্থে বলেন " কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও ভূমিকার সঙ্গে শাসন ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ভূমিকা তুলনীয়"। সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা আছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবেন।

নিয়োগ ও যোগ্যতা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। সবিধানের ১৬৪ নম্বর ধারায় বলা আছে "মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কতৃক নিযুক্ত হবেন" । রাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করতে হয়। সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রীর নিযুক্তির ব্যাপারে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য টানা হয়নি। অর্থাৎ রাজ্য আইনসভার যে কন কক্ষের সদস্য হলেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যাবে। তবে কোনো কক্ষের সদস্য না হলে মন্ত্রী হওয়ার ৬মাসের মধ্যে রাজ্য আইন সভার সদস্য হতে হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে বিধানসভায় অপেক্ষা অন্যান্য শক্তিগুলি, যথা - রাজ্যপালের সুনজর, দলীয় নেতৃত্ব, কেন্দ্রের অবস্থা, উচ্চতর নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অধ্যাপক জে.সি. জোহারী তাই বলেন, "The appointment of chief Minister is,

therefore a matter falling within the discretionary power of the Governor - a power that ought to be exercised very carefully and tactfully"

টিপ্পনী

কার্যকাল

সাধারনভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকাল কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর মতো পাঁচ বছর। রাজ্য বিধানসভার কাছে তাঁকে দায়িত্ব শীল থাকতে হয়। তবে বিধানসভা মেয়াদের পূর্বে শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকাল ও পাঁচ বছরের আগেই শেষ হয়ে যায়। এছাড়া বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় এবং কার্যকাল পূর্ন হবার আগেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সংসদীয় রীতি অনুসারে প্রকৃত প্রধান তথাপি মুখ্যমন্ত্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ বিবরন সংবিধানে মেলে না। আলোচনার সুবির্ধার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হল।

(ক) রাজ্যপালের পরামর্শদাতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী

সংবিধানে ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা আছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভা রাজ্যপালের পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করে থাকে। একইভাবে সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্য মন্ত্রীসভায় গৃহীত সিধান্ত রাজ্যপালকে জ্ঞান করতে হয়। মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তর নিয়ে প্রয়োজনে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তবে তা মূলত মূখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমেই ঘটে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন। কারণ তিনিই হলেন রাজ্যপালের মুখ্য পরামর্শ দাতা। এইভাবে রাজ্যপালকে শাসন বিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনে মুখ্যমন্ত্রী সহায়তা করেন। রাজ্যপালের পরামর্শ দাতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী কতটা কাজ করবেন তা নির্ভর কছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার উপর। মুখ্যমন্ত্রীর বভাক্তিত্ব সম্পন্ন হলে রাজ্যপাল আলংকারিক প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকেন।

(খ) মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শে রাজ্যপাল রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কোন

মন্ত্রী সংকট বা সমস্যার মুখোমুখি হলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সাহায্য করে থাকেন। তাঁকে সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের মধ্য অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করা হয়। কারন তিনি মন্ত্রীসভার আহ্বান করেন এবং সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে অনুসারে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টিত হয় এবং মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী অবস্থান স্থির করেন। তিনি ঠিক করেন কোন ধরনের কতজন মন্ত্রী থাকবেন। মন্ত্রীসভার পরিধি, নিয়োগ দপ্তর বন্টন ইত্যাদি মুখ্যমন্ত্রী স্থির করেন। একই রকম ভাবে কোনো মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরন করলে তাঁর মন্ত্রীত্ব চলোএ যায়। মুখ্যমন্ত্রী দুভাবে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিতে পারেন - কোন মন্ত্রীকে অব্যাহতি দেবার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ জানাতে পারেন এবং তিনি নিজে পদত্যাগ করে নতুনভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে অনাকাঙ্খিত মন্ত্রীকে বাদ দিতে পারেন।

টিপ্পনী

(গ) বিধানসভার নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী

সংসদীয় সরকারের রীতি অনুযায়ী যে দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের আইনসভায় মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ন বিলগুলি উত্থাপন করেন। তিনি সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবৃতি দেন। তিনি রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা ও স্থগিত করার জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য অনুরোধ জানালে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য অনুরোধ জানালে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী নিজে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁকেই উদ্যোগী নিতে হয়। তিনি বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে তৎপর থাকেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করতে হয় - সরকারের প্রধান হিসেবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আইনসভার কাজকর্ম পরিচালনা এবং আইনসভার মর্যাদা রক্ষা করা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কাজ।

(ঘ) দলের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার গুলিতে কোনো না কোনো দল সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে তারাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সরকার গঠন করে এবং সেই দলের নেতাই হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য রাজনীতিতে যত ক্ষমতাশীল হবেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব ততই মর্যাদাসম্পন্ন হবে। রাজ্যে দলের ভাবমূর্তি মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

(ঙ) রাজ্যে জনগণের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী

টিপ্পনী

মুখ্যমন্ত্রী যদি ব্যাপক অংশের জনগণের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে সেই মুখ্যমন্ত্রী সাফল্যের শীর্ষে অতি সহজেই নিজেককে উপস্থিত করতে পারেন। স্যার আইভর জেনিংস এ প্রসঙ্গে বলেন " He is in fact much like a film star though not being employed by project making company, he has no publicity manager to see that he hits the headlines. Even so is possible build himself a reputation."

মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা

মুখ্যমন্ত্রীর বাক্তিগত সততা, দক্ষতা, চরিত্র ও কর্মমুশলতার ওপরে তাঁর মর্যাদা নির্ভর করে। তবে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমক্ষমতা সম্পন্ন নন। সাম্প্রতিকালে মুখ্যমন্ত্রীদের পদমর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। জে. সি. জোহারি তাই বলেন বিদ্যমান মুখ্যমন্ত্রীরা তিন ধরনের - দর্শনধারী, বক্তা ও পিওন মুখ্যমন্ত্রী। অথাৎ কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস সরকার থাকলে বা কেন্দ্র ও রাজ্যে বি.জে.পি সরকার থাকলে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নাম কা ওয়াস্তে থাকেন। তাঁরা দোকানের শোকেশে থাকার মতো নির্জীব মুখ্যমন্ত্রী। তাদের কেন্দ্র যেমন বলেন সেই অনুসারে পরিচালিত হয়। যেমন কেন্দ্রে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আর পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর রায়। আবার বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দাবীর সপক্ষে বহু বক্তব্য রাখেন কিন্তু কাজ আদায়ে বিশেষ সক্ষম হন না। এ ধরনের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় টিকে থাকা সূক্ষ্ম সুতোর ওপর নির্ভর করে। এঁরা বক্তা মুখ্যমন্ত্রীর শ্রেনী ভুক্ত। যেমন - ১৯৯৯ সালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ী দেবীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সরকার বরখাস্ত হয়। আবার পিওন মুখ্যমন্ত্রী হলেন সম্মিলিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। যিনি বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাতে পারেন, তবেএই মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন না।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় ব্যপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে জাতীয় নীতি নির্ধারনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কতৃক বার বার আহ্বান অথবা বাজপেয়ী কতৃক অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

চন্দ্রবাবু নাইডুর কাছে বিশেষ দূত প্রেরন অথবা জয়ললিতার কাছে ফার্নান্ডেজের বা যশোবন্ত সিংহের ঘন ঘন উপস্থিতি এককথাই প্রমান করে।

১.৪ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ

টিপ্পনী

ভারতের রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্রিটেনের মতো মন্ত্রী পরিষদ চালিত শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৭৪নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠনের কথা বলা আছে । মন্ত্রীপরিষদে পরিচালিত সরকারের রীতি অনুসারে যে দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন । চরন সিং, ভি.পি.সিং, চন্দ্রশেখর প্রমুখের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহন কালে বা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হঠাৎ প্রয়াণে রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহনকালে রাষ্ট্রপতির তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে একটি শর্ত মেনে চলতেই হয়। তা হল মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করলে তাঁকে লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য হতে হবে এবং যদি শপথ গ্রহন কালে তিনি সদস্য না থাকেন তাহলে ৬মাসের মধ্যে সংসদের সদস্য অবশ্যই হতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যসভার সদস্য থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী হন ; নরসিমা রাও কোন কক্ষের সদস্য না থেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তবে ৬মাসের মধ্যে তিনি লোকসভার সদস্য হন।

সংবিধানে মন্ত্রীসভার গঠন, সদস্য সংখ্যা ও শ্রেনীবিভাজন সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই, ভারতে ব্রিটেনের অনুকরণে তিনধরনের মন্ত্রী দেখা যায় - ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। ক্ষমতা, বেতন ও পদমর্যাদার দিক থেকে এই তিন প্রকার মন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভারতে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা ১৫ - ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর একাংশ নিয়ে কিচেন কাবিনেট তৈরী হয়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় ও নরসিমা রাওকে নিয়ে কিচেন ক্যাবিনেট হয়েছিল।

ভারতে মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মাঝে মাঝে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি। জওহরলাল নেহরুর আমলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে মোরারজী দেশাই, মোরারাজি দেশাই এর আমলে চরন সিং ও জগজীবন রায়

টিপ্পনী

উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন । অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলেও লালকৃষ্ণ আডবানী উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা এক নয়। কারণ সব মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গড়ে ওঠে কিন্তু সব মন্ত্রীই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নয়। সরকার পরিচালনা, জাতীয় নীতি নির্ধারন, আন্তর্জাতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ন কাজে গোপনিয়তা রাখার জন্য কয়েকজন প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বেছে নেন। এরাই হলেন ক্যাবিনেট মন্ত্রী।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা পূর্ন মন্ত্রীরা মাসিক ১৪০০০ টাকা বেতন এবং ১৪০০০ টাকা ভাতা পান। এছাড়া বছরে বাড়িভাড়া বাবদ, আসবাবপত্র বাবদ, মালী, দারোয়ান ও ঝাড়ুদার বাবদ ও অন্যান্য খরচ বাবদ বেশ কিছু টাকা পান। প্রত্যেক মন্ত্রী গাড়ি, পেট্রল, ড্রাইভার, বিদ্যুৎ, ফোন, বিমানভাড়া, রেলভাড়া ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মাসিক বেতন ১৩০০০ টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান।

মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

মন্ত্রীপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানে বিস্তারিত আলোকপাত করা না হলেও কার্যালীর পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রী পরিষদের কার্যাবলীকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) নীতি নির্ধারন সংক্রান্ত কার্যাবলী

অন্যান্য মন্ত্রী পরিষদ চালিত সরকারের মতো দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারন করা মন্ত্রী পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন কাজ। বর্তমানে সরকার কল্যানমূলক রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহন করায় মন্ত্রী পরিষদের কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অর্থনৈতিক নীতি, সামাজিক নীতি ও রাজনৈতিক নীতিসমূহ নির্ধারন করার দায়িত্ব মন্ত্রী পরিষদের। যেমন আয়করের উর্ধ্বসীমা বাড়ানো বা সারে ভর্তুকি দান রদ অথবা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বেসরকারিকরন - সেই সম্পর্কিত নীতি মন্ত্রীসভা স্থির করে।

(খ) আইনসংক্রান্ত কার্যাবলী

মন্ত্রী পরিষদের যে সমস্ত নীতি নির্ধারন করে সেই সমস্ত নীতি যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণ করে থাকে। সংসদীয়

শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ভারতে কোনো বিষয়ে আইন প্রনয়নের পূর্বে সে বিষয়ে ক্যাবিনেটকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং আইন মন্ত্রকের অনুমোদন সাপেক্ষে তা সংসদে উত্থাপিত হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতে ও মন্ত্রীপরিষদই গুরুত্বপূর্ন বিলগুলি সংসদে উত্থাপন করে। মন্ত্রীপরিষদ উত্থাপিত বিল সমূহকে যা সরকারি বিল নামে পরিচিতি যদি সংসদ কতৃক অনুমোদিত না হয় তাহলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সেহেতু মন্ত্রীসভা গঠন করে তাই সরকারি বিলগুলি সহজেই আইনে পর্যবসিত হয়।

টিপ্পনী

(গ) শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী

ভারতে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে যাবতিয় শাসন ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর নামেই দেশ শাসিত হয়। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত শাসন তান্ত্রিক কার্য মন্ত্রীপরিষদ সম্পন্ন করে। বিশেষত ৪২তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ল মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা শাসন বিষয়ে যে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি তা মেনে চলতে বাধ্য। শুধু একবার পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ রাষ্ট্রপতি জানাতে পেরেন।

(ঘ) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংহতি সাধন

মন্ত্রী পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠ নীতিতে পরিচালিত করতে হলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অত্যন্ত জরুরি। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের অধীনে এক বা একাধিক দপ্তর থাকে। মন্ত্রীরা অধঃস্তন কর্মচারীদের সহায়তায় নিজ নিজ দপ্তরের কার্য সম্পাদন করেন। বিভিন্ন দপ্তরের কাজে সংহতি সাধনের প্রয়োজন হয়, কারণ এক দপ্তরের কাজে সংহতি সাধনের প্রয়োজন হয়, কারন এক দপ্তরের সিদ্ধান্তের সাথে অপর দপ্তরের সম্পর্ক থাকে। ভারতের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মন্ত্রীসভার একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে।

(ঙ) বাজেট প্রনয়ন সংক্রান্ত কাজ

প্রতিবছর সরকার তার আয়ব্যায়ের হিসেব আইন সভায় পেশ করে তাকে বাজেট বলে। মন্ত্রী পরিষদ বাজেট রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঊমিকা পালন করে।

টিপ্পনী

প্রধানমন্তরীর সাথে পরামর্শ করে অর্থমন্ত্রী খসড়া বাজেট রচনা করেন এবং এই বাজেট লোকসভায় পেশ করেন। বাজেট রচনাকালে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদেদর সঙ্গে অর্থমন্ত্রী আলাপ আলোচনা করেন এবং মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদন লাভ করার পর তা লোকসভায় উপস্থিত করা হয়।

(চ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন

বর্তমানে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন আবশ্যক। ভারতে পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন আছে। প্রধানমন্ত্রী এই কমিশনের সভাপতি। এছাড়া তিনজন মন্ত্রী এই কমিশনের সদস্য। যারা মন্ত্রীসভার পক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের নীতি রূপায়নে পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

(ছ) বৈদেশিক নীতি নির্ধারন সংক্রান্ত কার্যাবলী

বৈদেশিক নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদের ব্যাপক গুরুত্ব পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশী রাষ্ট্রের প্রধান বা সরকারের সঙ্গে আলাপ - আলোচনা করেন এবং দেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল করেন। সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রীসভা ঠিক করে। বিদেশী রাষ্ট্রে ভারতের যে সমস্ত প্রতিনিধি থাকেন তাঁরা মন্ত্রীসভার নির্দেশে কার্য পরিচালনা করেন।

(জ) নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী

ভারতের মত গুরুত্বপূর্ন প্রশাসনিক পদ আছে যথা - রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যবৃন্দ, অর্থ কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সামরিকবাহিনীর প্রধান, বিচারপতিগণ প্রমুখের নিয়োগ তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি করে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে এই সমস্ত নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধিন মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী হয়।

সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে সংসদের কাছে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নীতি পালিত হয়। মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। এই দায়িত্ব Collective Responsibility বা যৌথ দায়িত্ব রূপে পরিচিতি।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্রীপরিষদ কতৃক ভারতের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি থাকলেও তিনি সর্বদা মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মেনে চলেন। ব্রিটেনের মত ভারতেও মন্ত্রী পরিষদ জাতীয় নীতি নির্ধারন,

প্রশাসনকে নেতৃত্বদান এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। তাই হলওয়েলের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় ভারতে মন্ত্রী পরিষদ হল "Keystone of the political arch"

১.৫ - রাজ্য মন্ত্রীপরিষদ

টিপ্পনী

সংবিধানের ১৬৩(১) নম্বর ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করে মন্ত্রীসভা থাকে। এই মন্ত্রীসভা যৌথভাবে রাজ্য বিধানসভার কাছে দায়ী এবং রাজ্যপালকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করে থাকে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীসভার বাকি মন্ত্রীরা রাজ্যপাল কতৃক নিযুক্ত হন। সাধারনভাবে যে দল বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। যদিকোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম না হয় তাহলে একাধিক দলের মোর্চাকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য রাজ্যপাল আহ্বান জানান।

রাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্য হতে হলে কোনো ব্যাক্তিকে অবশ্যই রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে হয়। যদি মন্ত্রীপদে আসীন হবার সময়ে আইনসভার সদস্য না থাকেন তাহলে তাকে ৬মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হতে হয়। ভারতের সব অঙ্গরাজ্যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা নেই। যেখানে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিধান পরিষদের সদস্য হলেও চলে। তবে ভারতের অঙ্গরাজ্য গুলিতে রাজ্য বিধানসভার সদস্যরাই সাধারনভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদে অসীন হন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের বিধানসভার সদস্য হিসেবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি।

অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা কত হবে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই রাজ্যের আয়তন, জনসংখ্যা, সরকারের কাজকর্মের ব্যাপকতা এবং যদি জোট সরকার হয় তাহলে সব দলের প্রতিনিধি সংখ্যা অনুপাতে মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা স্থির হয়। রাজ্যে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ তিনটি শ্রেনিতে বিভক্ত - ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ রাজ্য সরকারের নীতি ও নির্ধারনের অংশ নেন। তাই তাঁরা রাজ্য শাসনের গুরুত্বপূর্ন পদগুলি অলংকৃত করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা অপেক্ষকৃত কম গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে থাকেন। ক্যাবিনেটের আলোচনায় তারা সরাসরি

টিপ্পনী

অংশগ্রহন করতে পারেন না। শুধু আমন্ত্রীত হলে তাঁরা ক্যাবিনেট যোগ দিতে পারেন। উপমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাজে সহায়তা করে থাকেন।

রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে সংবিধানে বলা আছে - মন্ত্রীরা যতদিন রাজ্যপালের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এবং মন্ত্রীসভার সদস্যরা যৌথভাবে বিধানসভার কাছে দায়ী। তবে সাধারনভাবে রাজ্য মন্ত্রীসভা যতদিন রাজ্য বিধানসভায় আস্থাভাজন থাকে ততদিন নিজপদে বহাল থাকেন। রাজ্য মন্ত্রী সভার স্বাভাবিক কার্যকাল পাঁচবছর, তবে মেয়াদ পূর্ন হবার আগেই রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যকাল শেষ হবার বহু নজির আছে।

রাজ্য মন্ত্রীসভায় উপমুখ্যমন্ত্রী পদের কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকলে ও কোনো কোনো রাজ্যে উপমুখ্যমন্ত্রীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে বর্তমানে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারিত না হলে মন্ত্রীপরিষদে সাংবিধানিক মর্যাদার চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারন করা অসম্ভব।

রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যাবলী

ভারতে কেন্দ্রের মত রাজ্যে ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আত্মগতভাবে রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত শাসন বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে মন্ত্রীসভা রাজ্যপালের পক্ষে সব কাজ সম্পাদন করে। রাজ্যে মন্ত্রীসভা যে সব কাজ সম্পাদন করে তা হল -

(ক) নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন

রাজ্য সরকারে নীতি নির্ধারন ও তা রূপায়ন মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কাজ। বর্তমানে কোনো সরকারের কাজ আগের তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রীপরিষদ নীতি নির্ধারন করে এবং সেই অনুসারে সরকারী বিভাগগুলি পরিচালিত হয়। যেমন - রাজ্যে বৃত্তি কর আরোপ হবে কিনা বা প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল পুনঃ প্রবর্তন করা হবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব হল রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের।

(খ) আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী

আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীসভার ন্যায় রাজ্যমন্ত্রীসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত ও

যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে। রাজ্য আইনসভার সমস্ত গুরুত্বপূর্ন বিল রাজ্য মন্ত্রীসভা উত্থাপন করে। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরই আইন সভায় সাধারনভাবে কোনো বিল আইনে পরিণত হয়। তবে এরকম কোন বিল রাজ্য আইনসভা কতৃক প্রত্যাখ্যাত হলে রাজ্য মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

টিপ্পনী

(গ) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্য প্রশাসন যাতে সচল থাকে তার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভায় গৃহীত নীতির রূপায়নের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপরাজ্য মন্ত্রীসভা গ্রহন করে। সেই অনুসারে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনও করে থাকে মন্ত্রীপরিষদ। অর্থ দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও করে থাকে মন্ত্রী পরিষদ। অর্থ দপ্তরের সাথে অন্য দপ্তরের অর্থ বরাদ্দকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঘটে থাকে। তার সমাধান ও মন্ত্রী পরিষদের গুরুত্বপূর্ন কাজ বলে স্বীকৃত।

(ঘ) অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী

প্রতি বছর রাজ্য সরকার তার আয়-ব্যায়ের আনুমানিক হিসেব অর্থাৎ বাজেট রাজ্য আইনসভায় ওপেশ করে, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা এই বাজেট প্রনয়ণে পরিষদের সদস্যরা এই বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করে থাকেন। প্রতিটি মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের সম্ভাব্য আয় ব্যায়ের হিসেব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাজির করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে অর্থমন্ত্রী রাজ্যের বাজেট রচনা করেন এবং তা প্রতি বছর রাজ্য বিধানসভায় পেশ করেন।

(ঙ) পরিকল্পণাসংক্রান্ত কার্যাবলী

রাজ্যসরকারের কার্যকলাপ আগের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই রাজ্যে পরিকল্পনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহায়তায় নিয়ে রাজ্য মন্ত্রীসভা রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ, অনুমোদন ও অর্থ সংগ্রহ করা রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ন কাজ। প্রতি বছরই মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে তাদের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছেউপস্থিত করার দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(চ) অধ্যাদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলী

রাজ্য আইনসভার অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন কোনো গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে হলে রাজ্যপাল অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ

টিপ্পনী

রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শে রচিত হয় এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শেই তা জারি হয়। তবে রাজ্য আইনসভার অধিবেশন শুরু হলে ছ'সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদিত হতে হয়, না হলে তা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

বর্তমানে রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যাবলী ক্রমবর্ধমান। গ্লাডেন বলেন "আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মধারা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত ব্যপ্ত হয়েছে।" সুতরাং রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যাবলী কোনো সংকীর্ন গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সংসদীয় ব্যবস্থায় সর্বত্র আইন বিভাগের ওপর শাসনবিভাগের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায় শাসন বিভাগের কর্মক্ষেত্র যে সম্প্রসারিত হয়েছে ভারতের অঙ্গরাজ্য গুলিতে ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

১.৬অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ কীভাবে গঠিত হয়?

(২) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের কার্যাবলী আলোচনা কর?

(৩) রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে লেখ?

(৪) রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও পদমর্যাদা সম্পোর্কে আলোচনা কর?

(২) 'প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক' - ব্যাখ্যাকর?

(৩) রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর?

(৪) রাজ্যের পজরকৃত শাসক মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে লেখ?

(৫) রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা সম্পর্কেআলোচনা কর?

১.৭নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্র, কলকাতা - ২০১০

(২) অনাদি কুমার মহাপাত্র, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনিতি" প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(৩) প্রানগোবিন্দ দাস, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" সেন্ট্রাল, কলকাতা - ২০১০.

(৪) S. L. Sikri, "Indian Government and Politics", Kalyani Publisher, New Delhi - 1997

(৫) M.V. Pylee, "Indian Goverment and Politics", Asia Publishing House, New Delhi , 1999

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইন বিভাগ

টিপ্পনী

২.১ - ভূমিকা

২.২ - কেন্দ্রীয় আইসভা

২.৩ - রাজ্যের আইনসভা

২.৪ - আইনপ্রনয়ন পদ্ধতি

২.৫ - পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের বিশেষাধিকার

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - নির্বাচিতগ্রন্থপঞ্জী

২.১ - ভূমিকা

প্রতিটি গণতান্ত্রিকরাষ্ট্রে আইন প্রনয়ন মূল দায়িত্ব বর্তায় আইনসভার ওপর। ভারতের আইন প্রনয়ণের জন্য কেন্দ্রে সংসদ এবং রাজ্যের জন্য রাজ্য আইনসভা আছে। ভারতীয় সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট - রাজ্যসভা ও লোকসভা। সংবিধানের পঞ্চম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭৯ থেকে ১২২ নম্বর ধারায় সুবিস্তৃত ভাবে ভারতের সংসদ সম্পর্কে আলোচনা আছে। আমাদের দেশে সংসদ বলতে রাষ্ট্রপতি সহ পার্লামেন্টেকে বোঝায়। ভারতের সংবিধানের ৭৯নম্বর ধারা অনুসারে "ইউনিয়নের একটি সংসদ থাকবে যা রাষ্ট্রপতি ও দুটিকক্ষ নিয়ে গঠিত হবে, সেগুলি যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভা নামে পরিচিত হবে"।

২.২ সংসদের গঠন

(ক) রাজ্যসভা

পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভায় ২৫০ জনের বেশী সদস্য থাকতে পারবে না। এর মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করতে পারেন। যাদের বিজ্ঞান,

টিপ্পনী

সাহিত্য, চারুকলা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে তাঁদের মধ্যে থেকেই এই ১২ জন মনোনীত হন। অবশিষ্ট ২৩৮ জন সদস্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট এর দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। ইউনিয়ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্যে পার্লামেন্ট আইন দ্বারা প্রতি ইউনিয়ন অঞ্চলের জন্য একটি করে নির্বাচন সংস্থা গঠন করে। অঙ্গরাজ্য গুলির আসন সংখ্যা প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় উচ্চকক্ষে সকল অঙ্গরাজ্যের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। রাজ্যসভা হল একটি স্থায়ী কক্ষ। একে ভেঙে দেওয়া যায় না।

প্রতি ২ বছর অন্তর রাজ্যসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহন করেন এবং ঐপদে নতুন সদস্য নির্বাচিত হল। প্রতিটি সদস্যের কার্যকাল হল ৬ বছর। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার পদে রাজ্যসভার সভাপতি হন এবং সহসভাপতি সভার সদস্যের দ্বারা পাঁচবছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(খ) লোকসভা

সংসদের নিম্ন বা জনপ্রিয় কক্ষ হলো লোকসভা। লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৫০ এর বেশি হতে পারেন না। ১৯৯০ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা ২০০০ সালে ২৬ শে জানুয়ারী পর্যন্ত বজায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫৪৫। এদের মধ্যে ৫৩০ জন রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত হন এং অনধিক ১৩ জন ইউনিয়নের অঞ্চলের প্রতিনিধি। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের থেকে ২৩জন প্রতিনিধি মনোনীত করেন। লোকসভার সদস্যরা প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর, তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলেই এর আগে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। লোকসভার কার্যনির্বাহের জন্য প্রতিটি নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনে নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন অধ্যক্ষও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন।

ক্ষমতা ও কার্যালী

ভারতীয় সংবিধানের সংসদকে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে-

(ক) আইনবিষয়ক ক্ষমতা

টিপ্পনী

আইনসভা হিসেবে পার্লামেন্টের প্রধান কাজ হল আইন প্রনয়ন করা ; সংবিধান অনুসারে ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রনয়নের অন্যান্য ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে। যুগ্মতালিকার অন্তর্গত কোনো বিষয়ে রাজ্য আইনসভা প্রনীত আইনের সঙ্গে সংসদ প্রনীত আইনের বিরোধ দেখা দিলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ থাকে। আবার অনেক সময় রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়েও সংসদ আইন প্রনয়ন করতে পারে।

প্রথমত --কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে বা রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হলেসংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত - রাজ্যসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহন করন যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকা ভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রনয়ন করা উচিত তাহলে পার্লামেন্ট আইন প্রনয়ন করতেপারে।

তৃতীয়ত - দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা যদি মনে করে যে, ঐ রাজ্যগুলোর জন্যে পার্লামেন্টের আইন প্রনয়ন করা উচিত তাহলে রাজ্যতালিকাভুক্ত ঐ বিষয়ের ওপর পার্লামেন্ট আইন প্রনয়ন করতে পারে।

চতুর্থত - আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শর্তাদি পালন করার জন্যে যে-কোন তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংসদ আইন প্রনয়ন করতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভা ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থ বিল ছাড়া অন্য বিল সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। উভয়কক্ষে অনুমোদনের পরে সংশ্লিষ্ট বিলটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি অবশ্য বিলটিকে অনুমোদন না করে ফেরৎ পাঠতে পারেন। কিন্তু উভয় কক্ষের সম্মতির পর পুনরায় ঐ বিল রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হলে রাষ্ট্রপতির উক্ত বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। সাধারন বিল নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি কতৃক আহুত উভয়কক্ষের যৌথ

সভায় ভোটাভুটি দ্বারা বিলের পরিণতি নির্ধারিত হয়। কাজের চাপ ও জরুরি অবস্থা জনিত পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে সংসদ শাসন বিভাগকে বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা প্রদান করে।

টিপ্পনী

(খ) মন্ত্রীপরিষদের গঠন ও অপসারন

মন্ত্রীপরিষদ গঠন ও অপসারনে লোকসভার একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পড়ে রাজ্যসভার এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দল বা জোট সরকার গঠন করে ; রাজ্যসভার কোন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর মন্ত্রীপরিষদের গঠন নির্ভরশীল নয় । রাজ্যসভার যে কোন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু সাধারনভাবে লোকসভার সদস্যরাই অধিক সংখ্যায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রাজ্যসভার নিকট মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে দায়িত্বশীল নয় - মন্ত্রীপরিষদ নিজেদের কার্যের জন্যে লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। বস্তুত মন্ত্রীপরিষদের কার্যকাল নিয়ন্ত্রনে ও অপসারনে রাজ্যসভার কোন ভূমিকাই নেই । অর্থাৎ রাজ্যসভার মন্ত্রীপরিষদের অস্তিত্বের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না। মন্ত্রীপরিষদের কার্যকাল পাচ বছরের জন্যে হলেও প্রকৃতপক্ষে লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ওপর মন্ত্রীপরিষদের কার্যকাল নির্ভরশীল।

(গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা

সংসদের প্রধান কাজ হল শাসন বিভাগ এবং সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করা সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার কাছে যৌথ দায়িত্বশীল সংখ্যা গরিষ্ঠ - সদস্যদের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রীপরিষদকে পদত্যাগ করতে ব্যাধ্য হয়। বিতর্ক, সমালোচনা মূলতুবি প্রস্তাব; নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতির মাধ্যমে লোকসভা সরকারকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিভিন্ন কমিটির (গাণিতিক কমিটি, আনুমানিক ব্যায় কমিটি, যৌথ সংসদীয় কমিটি প্রভৃতি) মাধ্যমেও লোকসভা সরকারের কার্যের তত্ত্বাবধান করে। মন্ত্রীপরিষদ কোনো জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করছে কিনা তা দেখাও সংসদের দায়িত্ব । এইভাবে পার্লামেন্টের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি সরকারকে সংযত ও সতর্ক রাখে।

(ঘ) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা

সংবিধান সংশোধন করা পার্লামেন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ক্ষমতা, সংবিধানে সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। সংসদ উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতি ভোটে সংবিধান সংশোধন করা হয়। তবে কতকগুলি বিষয় সংশোধনের জন্যে রাজ্যের আইনসভাগুলি সম্মতি নিতে হয়।

টিপ্পনী

(ঙ) বিচার এবং অপসারন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা যদি সংবিধান বিরোধী কোনো কাজ করেন তবে তাদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা সংসদের আছে। এছাড়া ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক, ভারতের মুখ্য নির্বাচক কমিশনারকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদ প্রস্তাব গ্রহন করতে পারে। ইমপিচমেন্টে বা বিশেষ অভিযোগের মাধ্যমে সংসদ এই ক্ষমতা কার্যকর করে। সংসদ অধিকার ভঙ্গের জন্যে কোনো সাংসদ বা সাংসদ নন এমন ব্যাক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

(চ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যায় নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পিত হয়েছে। সংসদের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন আয় ব্যায় বা কর ধার্য করতে পারে না। প্রতিবছর আয়-ব্যায়ের হিসাব সহ বার্ষিক বিবরনী লোকসভায় পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় তহবিলের ওপর ধার্য ব্যায়ের জন্যে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা -পরীক্ষক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণের বেতন ও ভাতা এবং ভারত সরকারের ঋন এই ব্যায়ের অন্তর্গত, এই ব্যায় ছাড়া অন্যান্য ব্যায় পার্লামেন্টে অনুমোদন সাপেক্ষে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা সেই সরকারী ব্যায় সম্পর্কেএকমাত্র মন্ত্রীরা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। সংসদ ঐ ব্যায় বরাদ্দ অনুমোদন, প্রত্যাখান অথবা হ্রাস করতে পারে। কিন্তু ব্যায় বরাদ্দের বৃদ্ধি করতে পারে না।

(ছ) আপৎকালীন ঘোষনার অনুমোদন

জরুরী অবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংসদের উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান। উভয় কক্ষের দ্বারা জরুরি অবস্থার ঘোষনা

একমাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। আপৎকালীন ঘোষনা প্রত্যাহারের ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই। পূর্বে এই ঘোষনা রাষ্ট্রপতির একক এক্তিয়ারে ছিল। ৪৪ তম সংশোধনে লোকসভাকে এই ঘোষনা প্রত্যাহারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

টিপ্পনী

২.৩ - রাজ্যের আইনবিভাগ

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে। ফলে ভারতের সংবিধানে অঙ্গরাজ্যের জন্য রাজ্য আইনসভায় কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং সেই অনুসারে সংবিধানের ১৬৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যে আইনসভা থাকবে।

এই আইসভা রাজ্যপাল সহ এক কক্ষ বিশিষ্ট বা দ্বি - কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা হতে পারে। দ্বিক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকলে উচ্চকক্ষ বিধান পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ বিধানসভা নামে পরিচিত হবে। এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভা বিধান সভা নামে পরিচিত। রাজ্য আইনসভার সদস্যরা বিধায়ক নামে পরিচিত। ত্রিপুরার আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট।

(ক) বিধান পরিষদ

রাজ্যের উচ্চকক্ষের বিধান পরিষদ।ভারতে মাত্র পাঁচটি রাজ্যে বর্তমানে এই বিধান পরিষদ বর্তমান - বিহার, উত্তরপ্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক। তবে সব রাজ্যে বিধানপরিষদ এক প্রকারের নয়।

বিধান পরিষদের গঠন

সংবিধানের ১৭১ (১) ধারায় বিধান পরিষদের গঠন সম্পর্কে কতগুলি নির্দেশ আছে। যথা - বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ঐ রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক - তৃতীয়াংশের বেশী সাধারনভবে হবে না। বিধান পরিষদের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হবে ৪০ জন, বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যার আনুপাতিক হবে।

বিধানসভার সদস্যদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বায়ত্তশাসন মূলক সংস্থার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন ; প্রায়এক -তৃতীয়াংশ সদস্য বিধানসভায় সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন ; প্রায় এক - দ্বাদশাংশ রাজ্যের স্নাতকদের দ্বারা নির্বাচিত হন ; প্রায় এক - দ্বাদশাংশ রাজ্যের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন ; বাকি সদস্যরা রাজ্যপাল কতৃক

মনোনীত হন।

বিধান পরিষদের নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য হতে হলে কোনো ব্যাক্তিকে - (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) ন্যূনতম ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে, (৩) সংসদ নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার অধিকারী হবেন এবং (৪) তিনি সরকারের কোনো লাভজনক পদে থাকবেন না, আদালত কতৃক দেউলিয়া ও বিকৃত মস্তিস্ক বলে ঘোষিত হবেন না।

রাজ্যসভার মত রাজ্য বিধান পরিষদ স্থায়ী কক্ষ। প্রতি দু'বছর অন্তর বিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিধান পরিষদের সদস্যদের কার্যকাল ৬বছর, প্রতি দু'বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহন করেন এবং সমসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ভারতের সব অঙ্গরাজ্যে বিধানসভা নেই। বিধান পরিষদগুলির হাতে কোনো গুরুত্বপূর্ন ক্ষমতাই ন্যাস্ত করা হয়নি। বিধান পরিষদ গুলি যে ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করে তা আলোচনা করা হল।

আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্য আইনসভার মূল কাজ হল আইন প্রনয়ন করা। আইন প্রনয়নের জন্য সাধারন বিল বিধানপরিষদ বা বিধানসভায় অর্থাৎ যে কোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। বিধানপরিষদে বিলটি গৃহীত হলে তা বিধান পরিষদে অনুমোদনের জন্য আসে। বিধানসভা কতৃক প্রেরিত বিলে বিধান পরিষদ সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন বা সংশোধন করার পর ৩মাসের মধ্যে বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হয়। তবে ৩মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠালে পুনরায় বিলটি বিধানপরিষদে পেশ করা হয় এবং ১মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠালে ধরে নেওয়া হয়, উভয় কক্ষই বিলটিকে অনুমোদন দিয়েছে।

অর্থ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্য বিধানসভায় অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। কারণ কোনো অর্থবিল বিধান পরিষদে উত্থাপন করা যায় না। বিধানসভায় অর্থ বিল গৃহীত হলে বিধান পরিষদে প্রেরিত হয় তে ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ বিলফেরত পাঠাত হয়। ১৪ দিনের মধ্যে

টিপ্পনী

ফেরত না পাঠালে উভয় কক্ষেই বিলটি গৃহীত হয়েছে ধরে নেওয়া হয়।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

টিপ্পনী

বিধানপরিষদ বিভিন্ন প্রস্তাব, প্রশ্ন উত্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং নিন্দা প্রস্তাব গ্রহন করে বিধানসভাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

তবে বাস্তবে বিধানপরিষদ যে অপরিহার্য নয়, তা ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ৫টিতে থাকাই সে কথা প্রমান করে।

(ক) বিধানসভা

ভারতের ২৯টি অঙ্গরাজ্যেই শুধু নয় ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ও বিধানসভা বিরাজমান। বিধানসভা হল জনপ্রতিনিধি কক্ষ। সুতরাং কেন্দ্রের নিম্নকক্ষ তথা লোকসভার মতো রাজ্যের নিম্নকক্ষ হল বিধানসভা। বিধানসভায় সদস্যরা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

ভারতীয় সংবিধানের ১৭০ (১) নম্বর ধারায় রাজ্য বিধান সভার গঠন নিয়ে আলোচনা করা আছে। সেই অনুসারে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ৫০০ এবং সর্বনিম্ন ৩০ জন। সাধারনভাবে ৭৫০০০ ভোটদাতা পিছু ১ জন সদস্য বিধান সভায় নির্বাচিত হবেন, তার উল্লেখ আছে। ৩৩৩ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারবেন।

সংবিধানের ১৭৩ নম্বর ধারায় রাজ্য বিধানসভার সদস্য হতে হলে - ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, তাঁকে ন্যূনতম ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং সংসদ কতৃক নির্দিষ্ট যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে। এর সাথে তিনি দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিস্ক ব্যাক্তি হবেন না। ১৭২ নম্বর ধারা অনুসারে বিধানসভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাজ্যপাল বিধানসভায় অধিবেশন আহ্বান করেন। বছরে দুটি অধিবেশন আহ্বান বাধ্যতামূলক।

বিধানসভায় অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য নিজেদেদর মধ্যে থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার সভার কাজ পরিচালনা করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ভারতের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে আইনসভাএককক্ষ বিশিষ্ট বিধানসভার কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করাহল।

আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত কার্য

টিপ্পনী

রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি তা রাজ্য বিধানসভা সাধারণত আইন প্রনয়ন করে থাকে। বিধানসভায় কোনো বিল পাশ হলে সেই বিল বিধানপরিষদে যায় এবং সেখানে অনুমোদিত হওয়ার পর রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়, অধিকাংশ রাজ্যে আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট হওয়ায় বিধানসভা কতৃত অনুমোদিত বিল সরাসরি রাজ্যপালের কাছে যায় স্বাক্ষরের জন্য।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানসভা রাজ্যের যাবতীয় আয় ব্যায় মঞ্জুর বা নিয়ন্ত্রন করার অধিকারী। রাজ্যের অর্থবিল একমাত্র রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপিত হতে পারে। সংবিধান অনুসারে নতুন কর প্রবর্তন, কর হারের পরিবর্তন, ঋন সংগ্রহ ইত্যাদি বিধানসভার সম্মতি ছাড়া রাজ্যে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্য বিধানসভা রাজ্যের জনপ্রতিনিধি সভা। সংসদীয় সরকারের নিয়ম অনুসারে রাজ্য মন্ত্রীসভা রাজ্য বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল। বিধানসভায় রাজ্য মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। রাজ্য মন্ত্রীসভাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নানা প্রকারের প্রস্তাব উত্থাপন, বিল পাস, বাজেট অনুমোদন ইত্যাদির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিধানসভা নিয়ন্ত্রন আরোপ করে থাকে।

অন্যান্য কার্যাবলী

বিধানসভায় মূলত আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হলেও শাসন বিভাগকে যেমন নিয়ন্ত্রন করে থাকে তেমনি অন্যান্য কাজও সম্পাদন করে থাকে। যেমন ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধন আইন রচনায় অংশগ্রহন করা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান করা। রাজ্য বিধানসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের

নিয়োগ ও পদচ্যুতি রাজ্যের পুর্নগঠন তথা নাম পরিবর্তন এবং রাজ্যে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে কি না তা স্থির করা।

রাজ্য বিধানসভার সংবিধানিক ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে সীমিত। মন্ত্রী পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে আইনসভা তাকে স্বীকৃত দেয়, বিধানসভা তাই আইন সংক্রান্ত, অর্থ সংক্রান্ত বা শাসন সংক্রান্ত প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নয়।

টিপ্পনী

২.৪ - আইন প্রনয়ন পদ্ধতি

ভারতীয় আইনসভা তথা সংসদের প্রধান কাজ হল আইন প্রনয়ন। আইনের খসড়া প্রস্তাবকে 'বিল' বলা হয় এবং এই ইলকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারী বিল ও বেসরকারী বিল। সরকারী বিলকে আবার দু' ভাগে বিভক্ত করা যায় - অর্থবিল ও সাধারন বিল। সরকারী বিলের অর্থ সেই সমস্ত আইনের প্রস্তাব যা মন্ত্রীসভার কোনো সদস্য আইনসভায় উত্থাপন করেন। আর বেসরকারী বিল হল সেই সমস্ত বিল যে কোন সাংসদ উত্থাপন করেন। তবে সাধারনভাবে অর্থবিলকে অর্থমন্ত্রী উত্থাপন করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী এই অর্থ বিল উত্থাপনের অধিকারী, সংবিধানের ১১০ নম্বর ধারায় অর্থবিল বলতে কর ধার্য, বিলোপ, পরিবর্তন এবং সরকারী ঋনগ্রহন সম্পর্কিত বিলকে বোঝায়।

সংসদীয় রীতি অনুসারে কোনো বিলকে আইনে পর্যবসিত হতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আবশ্যক। সেদিক থেকে বিচার করলে সরকার পক্ষ যে সমস্ত বিল আইন সভায় উত্থাপন করে সেই সমস্ত বিল সাধারনভাবে সরকারী আইন প্রনয়নের পদ্ধতিকেই বোঝায়। সরকারী বা বেসরকারী বিল আইনসভার যে কোন কক্ষে উত্থাপিত করা যায়। অর্থবিল কেবল লোকসভার উত্থাপন করা যায়। বেসরকারী বিল উত্থাপনের পূর্বে বিল উত্থাপন সংক্রান্ত নোটিশ অধ্যক্ষকে ১মাস আগে দিতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিলকে উত্থাপনের জন্য বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হয়। সরকারী বিলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসভা দ্বারা অনুমোদিত হলেই হয় এবং এজন্য অধ্যক্ষকে আগে কোনো নোটিশ দিতে হয় না। অধ্যক্ষের অনুমতি থাকলে যে কোন দিনই সরকারী বিলই উত্থাপিত হতে পারে। প্রতিটি বিল সরকারী বা বেসরকারী যে বিলই হোক না কেন তার কয়েকটি অংশ থাকে, যেমন - প্রস্তাবনা, মূল অংশ, বিলের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিবৃতি এবং অর্থিক স্মারকলিপি। তবে প্রতিটি সরকারী

বা বেসরকারী বিল আটটি পর্যায় অতিক্রম করার পর আইনে পরিণত হতে পারে। পর্যায়গুলির আলোচনা করা হল-

প্রথমপর্যায়

অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সাংসদ বিল উত্থাপন করেন। বিল উত্থাপন পর্বে শুধুমাত্র 'শিরোনামটি' পাঠ করা হয় সংশ্লিষ্ট কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা সমর্থন জ্ঞাপন করলেই বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হবার পর সরকারী গেজেট প্রকাশ করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহোদয় সভায় বিলটি উত্থাপন না করেও লোকসভার স্পিকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান অনুমতি ক্রমে সরকারী গেজেট প্রকাশ করতে পারেন। এরকম ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সভায় বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতি আর নিতে হয় না।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পাঠ শেষ হবার কয়েকদিন পরে লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার সভাপতির নির্ধারিত দিনে বিলের 'দ্বিতীয় পাঠ' শুরু হয়। এ পর্যায়ে বিল উত্থাপক যে কোনো চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন, যথা -(১) বিলটি এখনই বিবেচিত হোক, (২) বিলটিকে নির্বাচিত কমিটিতে প্রেরন করা হোক, (৩) সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে বিলটি প্রেরিত হোক এবং (৪) জনমত জানার জন্য বিলটি প্রচার করা হোক।

তৃতীয় পর্যায়

বিলটি 'নির্বাচিত কমিটিতে' যাবার পরঐ কমিটির সদস্যরা সেটি বিচার বিবেচনা করেন। এই কমিটিতে যেহেতু সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ উভয় পক্ষের সদস্যরা থাকেন তাই আলোচনার সমস্ত বক্তব্য নথিভুক্ত হয়। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় বলা হয়।

চতুর্থ পর্যায়

নির্বাচিত কমিটিতে আলোচনার ফলে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সহ প্রতিবেদনটি তৈরি হল তা সংশ্লিষ্ট কক্ষে উত্থাপিত হয়। এই পর্যায়কে 'প্রতিবেদন পর্যায় বলে। প্রতিবেদনটি আলোচনার জন্য গৃহীত হলে চতুর্থ পর্যায়ের অবসান হয়।

টিপ্পনী

পঞ্চম পর্যায়

পঞ্চম পর্যায়কে 'বিচার বিবেচনা পর্যায়' বলা হয়। এই পর্যায় বিলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন। কারন এই পর্যায়ে বিলের প্রতিটি ধারা - উপধারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করা হয়। বিস্তৃত বিতর্ক চলে। সংশোধনী প্রস্তাব ও উত্থাপিত হতে পারে। তবে যে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য কমপক্ষে ১দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। ব্যাপক আলোচনার পর বিলটির প্রতিটি ধারা - উপধারার ওপর ভোট গ্রহন করা হয়। এই ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করলে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না। এভাবে বিলের 'দ্বিতীয় পাঠ' শেষ হয়।

ষষ্ঠ পর্যায়

দ্বিতীয় পাঠ শেষ হবার পর কোনো একটি দিনে বিলের' তৃতীয়পাঠ' শুরু হয়। এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক বিলটি গ্রহনের জন্য প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিল সংক্রান্ত কোনো আলোচনা হয় না বা কোনো সংশোধনী গৃহীত হয় না। বিলটি সম্পূর্ন গ্রহন বা বাতিল করা হয়।

সপ্তম পর্যায়

সংসদের একটি কক্ষে গৃহীত হবার পর সংশ্লিষ্ট বিলটি অন্য কক্ষে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। এই কক্ষে ও বিলটি অনুরূপ ভাবে ঐরূপে ৬টি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গৃহীত হলে সপ্তম পর্যায়ের শেষ হয়। তবে একটি কক্ষ কতৃক বিল গৃহিত হবার পর অন্য কক্ষে প্রেরিত হলে সেইকক্ষ তিন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে - বিলটি গ্রহন, বিলটি প্রত্যাখান বা বিলটিকে ৬ মাসের জন্য আটকে রাখতে পারে।

অষ্টম পর্যায়

বিলটি উভয় কক্ষে গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।হবে রাষ্ট্রপতি বিলকে অসম্মতি জ্ঞাপন ও করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিলটি অবিকৃতভাবে যদি পুনরায় উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

এভাবেই সরকারীও বেসরকারী বিল আইনে পরিণত হয়।

২.৫ - পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের বিশেষাধিকার

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাব সাফল্য অনেকাংশ সংসদ ও সংসদের ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। সংসদ ও সংসদের তথা পার্লামেন্ট ও এম. পি দের ভূমিকা আবার অনেকাংশ নির্ভর করে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা অধিকার এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। এ কারনে প্রতিটি দেশে সংসদ ও সাংসদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয়। এগুলিকে এক কথায় পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ বলা হয়। ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে সাফল্য মন্ডিত করতে এ ধরনের সংসদীয় সুযোগ সুবিধা দলের কথা ঘোষিত হয়েছে।

পার্লামেন্টের বিশেষাধিকারের সংজ্ঞা নিরুপনে আরস্কাইন মে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তার মতে "পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষ সমষ্টিগত ভাবে এবং সদস্যরা ব্যাক্তিগতভাবে যে সমস্ত বিশেষ অধিকার ভোগ করেন তার সমষ্টিকে বলে বিশেষাধিকার। বস্তুত এই সমস্ত অধিকার ব্যাতীত পার্লামেন্ট ও তার সদস্যরা যথযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তাই প্রতিটি দেশেই আইনসভা সামগ্রিক ভাবে এবং আইনসভার সদস্যরা ব্যাক্তিগতভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন।

ভারতীয় সংবিধানের ১০৫ ও ১০৬ নম্বর ধারায় পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের বিশেষাধিকার সম্পর্কে উত্তর মেলে। এ উল্লেখ অত্যন্ত আশ্চর্যের ; কারন ১০৫ নম্বর ধারাতে বলা হয়েছে ভারতের পার্লামেন্ট ও তার কমিটি ও সদস্যগণ, যা যা বিশেষ অধিকার ভোগ করবে তা যতদিন না পার্লামেন্ট আইন প্রনয়নের দ্বারা স্থির করছে, ততদিন ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষ এবং তার কমিটি ও সদস্যগণ ব্রিটিশ কমন্সসভা ও তার কমিটি ও সদস্যগণ যে সব বিশেষাধিকার ভোগ করে তা ভোগ করবেন।

পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রনয়নের যে ক্ষমতা ১০৫ (৩) নং ধারায় ব্যাক্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত বিশেষ আইন রচনার উদ্যোগ দেখা যায় না। তবে পার্লামেন্ট সদস্যদের গ্রেপ্তার সম্পর্কিত কিছু আইন এবং শাসন সংক্রান্ত কিছু আইন রচনার উদ্যোগ গ্রহন করতে দেখা যায়। যাই হোক ১০৫ নং ধারায় ও পার্লামেন্টের রচিত আইন অনুসারে পার্লামেন্টে ও তার সদস্যদের অধিকার ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অব্যাহতি সম্পর্কে যে উল্লেখ মেলে তার ভিত্তিতে অধিকার ও অব্যাহতি গুলিকে মূলত দুটি ভাগে বিভাজন করে আলোচনা করা যায়। যথা -

(১) সাংসদদের ব্যাক্তিগত অধিকার ও অব্যাহতি

পার্লামেন্টের সদস্যরা ব্যাক্তিগতভাবে যে সমস্ত অধিকার ভোগ ও অব্যাহতি ভোগ করে তা আবার ৪টি ভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল -

(ক) সভাকক্ষের ভেতর বাক্‌স্বাধীনতা

পার্লামেন্টের সদস্যরা সভাকক্ষের অভ্যন্তরে বাক্‌স্বাধীনতা (Freedom of speech in Parliament) ভোগের অধিকারী। তবে এই বাক্‌স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রিত ; কারন কোনো স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছারিতা নয়। প্রতিটি সদস্যকে সংসদের নিয়ম মেনেই কথাবার্তা বলতে হয়। পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যথাযথ নিয়ম কানুন (Ruler and standing Order) আছে। লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তদনুসারে সদস্যদের বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন করে থাকেন। এ নিয়ম না মানলে স্পিকার বা চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সদস্যকে শাস্তি দিতে পারেন। এছাড়া কোনো সাংসদ অন্য কোনো সাংসদ সম্পর্কে মানহানিকর কোনো উক্তি করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষের আলোচনা সংক্রান্ত কার্যবিবরনী থেকে তা বাদ দেওয়াহয় এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করতে বা দুঃখপ্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাংসদ গণ সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্য সম্পাদনকালীন আচরনের জন্য কোনো প্রকার সমালোচনা করতে পারেন না ; তবে সংশ্লিষ্ট ঐ আদালতদ্বয়ের বিচারপতিদের পদচ্যুতি সংক্রান্ত প্রস্তাব আলোচনা করলে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

(খ) আদালতে অভিযুক্ত হওয়া থেকে অব্যাহতি

সংবিধানের ১৫০ (২) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কোনো সাংসদ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে বা কোনো সংসদীয় কমিটিতে বক্তৃতা বা ভোটদান করার জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। এছাড়া পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত প্রতিবেদন বা কার্যবিবরনীতে তথ্যাদি প্রকাশিত হয় তার জন্য কোনো ব্যাক্তিকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় সাংসদের অভ্যন্তরে

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে আলোচনা কালে নরেন্দ্র মোদিকে নানা গুনে গুনান্বিত বলে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু এই বক্তব্যের পেক্ষাপটে কোনো মামলা আদালতে দায়ের করে কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়নি।

(গ) গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার

টিপ্পনী

সাংসদরা গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করেন। পার্লামেন্ট অধিবেশন চলাকালে পার্লামেন্টের কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার বা আটক করা যায় না।ইংল্যান্ডের ন্যায় আমাদের দেশেও বর্তমানে পার্লামেন্টের অধিবেশন বা কোনো সংসদীয় কমিটির অধিবেশন শুরু হবার ৪০ দিন আগে বা কোন সংসদীয় কমিটির অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিনের মধ্যে দেওয়ানি অভিযোগে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না । তবে ফৌজদারি অভিযোগ বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে কোনো সাংসদকে গ্রেপ্তার করা হলে এ নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। এছাড়া দেওয়ানি অভিযোগে যদি পূর্ব হতে গ্রেপ্তার হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে অধিবেশনের সময় মুক্তি দিতেহয়।

(ঘ) জুরির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

বিচারের সময় পার্লামেন্টের কোনো সদস্যকে জুরির সদস্য হিসাবে কাজ করার জন্য বাধ্য করা যায় না। অধিবেশনে চলাকালে কোনো সদস্যকে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য হাজির হতে বাধ্য করা যায় না। ভারতীয় দন্ডবিধি (দেওয়ানির) ১৩৩ ধারা অনুসারে লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান দেওয়ানি মামলায় ব্যাক্তিগত ভাবে হাজিরা দেওয়া থেকে সততই অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন।

(২) পার্লামেন্টের সমষ্টিগত অধিকার ও অব্যাহতি

পার্লামেন্টের সদস্যদের ন্যায় পার্লামেন্ট স্বয়ং যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে সমষ্টিগতভাবে কতকগুলি অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করতে পারে। আরস্কাইন মে তাঁর গ্রন্থে বলেন Parliamentary and disciplinary power of legislative body are closely connected. The privilege are the necessary compliment of the functions and disiplinbary power of the parliament." ভারতের পার্লামেন্ট যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য অধিকার সমূহ ভোগ করে তা একে একে উল্লেখিত হল-

টিপ্পনী

(ক) আলোচনা ও বিতর্ক প্রকাশের অধিকার

পার্লামেন্টের যেসব আলোচনা ও বিতর্ক হয় সেগুলি পার্লামেন্টে প্রকাশ করতে পারে অথবা স্বেচ্ছায় তার প্রকাশকে বন্ধ করতে পারে বা অন্য কাউকে প্রকাশ করতে বাধা দিতে পারে। সাংবাদিকরা পার্লামেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ও ঘটনা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সভাপতি বা স্পিকার বিশেষ কোনো বিষয়কে প্রকাশের অনুমতি না দিতেও পারেন। উদাহরন স্বরূপ ৩০এপ্রিল ২০০২ সালে পার্লামেন্টে ১৮৪নম্বর বিধি মতে গুজরাটের গণহত্যা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা হয় দূরদর্শনকে তা সরাসরি সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয় নি।

(খ) বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধকরন

পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন কোনো ব্যাক্তিকে সভার যে কোন কক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্র নিষেধাজ্ঞা আলোচনা শোনার জন্য উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু যখন কোনো গোপন বিষয় আলোচনা হয় অথবা গুরুতর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অথবা বহিরাক্রমন জনিত সংকটকালে পার্লামেন্টে আলোচনাকালে বহিরাগত ব্যাক্তিদের পার্লামেন্টে প্রবেশ নিষেধ করতে পারে।

(গ) অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতিকে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রন

পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষ স্বীয় আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রনালী কীভাবে নির্ধারন, নিয়ন্ত্রন বা পরিচলনা হবে তা স্থির করে। সংবিধানে ১১৮ নম্বর ধারা অনুসারে স্ব স্ব কক্ষের নিয়মকানুন প্রনয়ন ও কার্যকর করতে পারে ; কিন্তু আদালত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। শুধু সভাকক্ষে হত্যাকান্ড ঘটলে তা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে পড়ে।

(ঘ) সাংসদদের অবমননার জন্য শাস্তি বিধান

পার্লামেন্টের উভয়কক্ষই অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার জন্য সদস্য অসদস্য নির্বিশেষে যে কোন ব্যাক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। এই শাস্তি লোকসভার স্পিকারের মাধ্যমে অথবা রাজ্যসভার চেয়্যারম্যানের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়ে থাকে।উদাহরন স্বরূপ বলা যায় - কোনো সাংসদ সভার কাজে বাধা দিলে অথবা অশোভন আচরন করলে অথবা স্পিকার বা চেয়ারম্যানের নির্দেশ না মানলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বহিস্কার বা

সাময়িক বরখাস্ত করতে পারে।

সংসদের ও তার সদস্যদের বিশেষাধিকার থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ বলেন বিশেষাধিকার থাকার অর্থই হল গণতন্ত্রকে অস্বীকার। কেউ কেউ বলেন এই বিশেষ অধিকারের সাহায্য নিয়ে সংসদ দেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রয়োজনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। আবার কেউ কেউ বলেন এই বিশেষাধিকার মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করবে। আমরা এ মতগুলিকে মেনে নিতে পারি না বরং বলতে পারি গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে ব্যাক্তিগত ভাবে সাংসদদের এবং সমষ্টিগতভাবে সাংসদ ও কমিটি গুলির বিশেষ অধিকার থাকাই কাম্য।

টিপ্পনী

২.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) ভারতের আইন প্রনয়ন পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা কর?

(২) পার্লামেন্টের সদস্যরা কীরূপ বিশেষাধিকার ভোগ করে থাকে?

(৩) বিধান পরিষদ কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলো চনা কর?

(২) বিধানসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

(৩) আইন পাশের পদ্ধতিটি বিস্তারিত লেখ?

২.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" মিত্র, কলকাতা - ২০১০

(২) অনাদি কুমার মহাপাত্র, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনিতি" প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(৩) প্রানগোবিন্দ দাস, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি" সেন্ট্রাল, কলকাতা - ২০১০.

(8) S. L. Sikri, "Indian Government and Politics", Kalyani Publisher, New Delhi - 1997

(৫) কল্যানকুমার সরকার, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রজনীতি" শ্রীভূমি, কলকাতা ২০১০

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট

টিপ্পনী

১.১ - ভূমিকা

১.২ - সুপ্রীম কোর্ট

১.৩ - হাইকোর্ট

১.৪ - লোকপাল

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ - ভূমিকা

ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যবস্থা । ভারতেও সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তিকারক এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসাবে ভারতের আদালত ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন তবে তারা মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন অস্টিনের ভাষায় বলা যায় এ ব্যবস্থা হল ভারয়তীয়দের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সমাজ বিপ্লবের একটি হাতিয়ার ইপ্সিত যে সাম্য থেকে তারা পরাধীন ভারতে ছিলেন বঞ্চিত তার রুপায়ণ।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত সংবিধানে এক অখন্ড বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে সর্বোচ্চ স্থানে তার নীচে অন্যন্য অধস্তন আদালত সমূহ। ভারতের বিচার ব্যবস্থাকে অনেকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।লর্ড ব্রাইসের প্রখ্যাত মন্তব্য বিচার বিভাগের উৎর্কষ শাসনব্যবস্থার উৎর্কষ প্রমান করে স্মরণে রেখে ভারতে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনার অবতারনা করা যায়।

টিপ্পনী

১.২ - সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)

ভারত শাসন আইন অনুসারে 1935 সালে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৫০ সালে ঐ ফেডারেল কোর্ট সুপ্রীম কোর্ট নামে ভারতের সংবিধানে পরিচিতি লাভ করে। এই আদালত ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। তবে পূর্বতন ফেডারেল কোর্ট অপেক্ষা বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে।

গঠন

মূল সংবিধানে ১২৪ নম্বর ধারায় বলা ছিল ৭ জন বিচারপতি সহ একজন প্রধান বিচারক থাকবেন। তবে সংসদ প্রয়োজন মতো বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। তদনুসারে বিচারপতির সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১০জন, ১৯৬০ সালে ১৩ জন,১৯৭৭ সালে ১৭ জন এবং ১৯৮৬ সালে ২৫ জন করা হয়। সুতরাং বর্তমানে প্রধান বিচারপতিস্ সুপ্রীমকোর্টের মোট বিচারকের সংখ্যা ২৬ জন। এছাড়া দু'ধরনের বিচারক যথা সামাজিক এবং অস্থায়ী বিচারক সুপ্রীমকোর্টের সভায় এখা যায়। ভারত সংবিধানের ১২৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সুপ্রীমকোর্টের সভায় কাজ চলার মতো বিচারক উপস্থিত না থাকলে সাময়িক বিচারপতি নিযুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ কোন মামলায় বিচার করার সময় প্রয়োজনীয় বিচারপতির অভাব দেখা দিলে তথা 'কোরাম' না হলে রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতির ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজ্যের কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির সঙ্গে পরামর্শ করে সংশ্লিষ্ট্য হাইকোর্টের বিচারপতিকে সুপ্রীম কোর্টে সাময়িক বিচারপতি হিসাবে কাজ করার জন্য লিখিত ভাবে অনুরোধ করতে পারেন। অনুরূপভাবে সুপ্রীমকোর্টের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে অস্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগ করার কথা সংবিধানে ১২৮ নম্বর ধারায় উল্লেখিত আছে। তথা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। সুতরাং সুপ্রীমকোর্টের তিন ধরনের বিচারপতি যথা নিয়মিত, সাময়িক এবং অস্থায়ী বিচারপতি থাকেন।

নিয়োগ

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। বিচারক নিয়োগের

ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। তবে বিচারক নিয়োগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পরামর্শ করেন। আর প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাধারনত সুপ্রীমকোর্টের সবথেকে অভিজ্ঞ বিচারপতিকে নিয়োগ করে থাকেন। এই প্রথা স্বাধীন ভারতে গড়ে উঠলেও ১৯৭৩ সালে অভিজ্ঞ বিচারকদের বাদ দিয়ে শ্রী অজিত নাথ রায়কে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল। যাই হোক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ভিত্তিতেই ১৯৯৪ থেকে এ. এম. আহমদি প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। বর্তমানে কে. জি. বালাকৃষ্ণন প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

টিপ্পনী

যোগ্যতা

ভারত সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হলে ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়া নিম্নলিখিত তিনটি যোগ্যতার একটি থাকা আবশ্যক -

(১) কোনো হাইকোর্টে কমপক্ষে ৫ বছর বিচারক হিসাবে কাজ করতে হবে।

(২) ১০ বছর এক বা একাধিক হাইকোর্টের বা সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির মতো একজন বিচক্ষন আইন বিশারদ (Distinguished Jurist) হতে হবে।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল সুদীর্ঘ। তাঁরা ৬৫ বছর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। অন্যান্য সরকারি চাকরির কার্যকাল ৫৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে শেষ হয়। অবশ্য কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। অথবা তাঁর মৃত্যু হলে বিচারপতির আসন শূন্য হয়। এছাড়া কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে অক্ষমতা, সংবিধান ভঙ্গ অথবা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারন করতে পারেন। তবে অপসারন করার পূর্বে সংসদের উভয় কক্ষে অধিকাংশ সদস্যদের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিচারপতিকে অপসরন করার প্রস্তাবে গৃহীত না হলে

টিপ্পনী

রাষ্ট্রপতি এককভাবে কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন না। গত ১১ মে ১৯৯৩ সালে বিচারপতি ভি. রামস্বামীকে অপসারনের জন্য সংসদে অভিযুক্ত করা হয়। লোকসভার ৪০১ জন সদস্যের মধ্যে ১৯৬ জন বিরোধী সদস্য তাঁর অপসারনের পক্ষে ভোট দেন।

বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা

পর্যাপ্ত বেতন না দিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং ভারতের সংবিধানে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলা আছে। সম্প্রতি সংবিধান সংশোধিত করে বেতন হার প্রযোজ্য হয়েছে। তদনুসারে বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ১,০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতি ৯০,০০০ টাকা মাসিক বেতন পান। এছাড়া অন্যান্য ভাতা, পেনসন, সরকারি বাসভবন, গাড়ি, ফোন, ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করেন। বিচারপতিদের যে বেতন ও ভাতা পার্লামেন্টের আইন করে স্থির করে দেয় এবং তার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদত্ত হলে তাঁর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায় না। একমাত্র আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সুপ্রীম কোর্টের এলাকাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা (১)মূল এলাকা (২)আপিল এলাকা (৩)পরামর্শদান এলাকা (৪) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা।

(১) মূল এলাকা

যে সমস্ত মামলা একমাত্র সুপ্রীমকোর্টেই দায়ের করা যায় এবং একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলি 'সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার অন্তভূক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে প্রথমত :

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ।

(গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারে মধ্যে বিরোধ।

উদাহরন স্বরূপ , মূল এলাকায় ১৯৬১ সালে খনি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলায় কথা উল্লেখ করা যায়

দ্বিতীয়ত - রাষ্ট্রপতি ও উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তির অন্যান্য ক্ষমতা সুপ্রীমকোর্ট করে থাকে। ১৯৬৯ সালে শিবকৃপাল সিং, ফুল সিং প্রমুখ রাষ্ট্রপতি পদে ভি. ভি. গিরির নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন।

টিপ্পনী

(২) আপিল এলাকা

সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। আপিল আদালতের অর্থ হল অধস্তন আদালতে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করার ক্ষমতা ভোগ করে। ফলে সুপ্রীম কোর্টের এক বিস্তৃত আপিল এলাকা আছে যাকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল (খ) দেওয়ানি আপিল (গ) ফৌজদারি আপিল (ঘ) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল এলাকা।

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল এলাকা

দেওয়ানি ; ফৌজদারি অথবা অন্য কোনো মামলার রায় প্রসঙ্গে যদি হাইকোর্ট প্রমানায় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন জড়িত তাহলে সেই মামলার রায়ের বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আপিল করা যায়। অথবা এই মর্মে হাইকোর্ট প্রমানপত্র না দিলেও বা দিতে অস্বীকার করলেও সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত যে কোনো মামলা বিচারের জন্য সুপ্রীমকোর্ট স্বয়ং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আপিল করার অনুমতি দিতে পারে।

(খ) দেওয়ানি আপিল

কোনো দেওয়ানি মামলার সঙ্গে ২০,০০০ টাকা মূল্যের প্রশ্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকলে হাইকোর্ট উক্ত মামলায় যে রায় দেয় সেই রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টে আপিল করা যেত। বর্তমানে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এই অর্থ সংক্রান্ত প্রমানপত্রের প্রয়োজন নেই।

টিপ্পনী

(গ) ফৌজদারি আপিল এলাকা

সুপ্রীমকোর্টের কাছে তিন ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আপিল করা যায়। (১) নিম্ন আদালতের কোনো ফৌজদারি মামলা নোর্দোষ বলে প্রমানিত কোনো ব্যাক্তিকে হাইকোর্ট মৃত্যুদন্ড দিলে ; (২) কোনো ফৌজদারি মামলা নিম্ন আদালতে চলাকালে যদি হাইকোর্ট স্বহস্তে ঐ মামলা তুলে নেয় এবং অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে ; অথবা (৩) কোনো ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্ট যদি নিজে থেকে কোনো প্রমানপত্র দিয়ে বলে যে সংশ্লিষ্ট মামলাটি সুপ্রীমকোর্টে আপিল করার যোগ্য তাহলে উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপিল করা যাবে।

(৩) পরামর্শদান এলাকা

সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারায় বলা আছে কোনো আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। সুপ্রীমকের্টে তখন উক্ত বিষয়ে শুনানি করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। এই পরামর্শ সুপ্রিমকোর্ট দিতে বাধ্য নয়। অনুরূপভাবে, যদি সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তা মেনে চলতেও বাধ্য নন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে ; আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের কাছে যতবার পরামর্শ চেয়েছেন সুপ্রীমকোর্ট ততবারই পরামর্শ দিয়েছে এবং সুপ্রীমকোর্ট যতবার পরামর্শ দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ততবারই গ্রহণ করেছেন।

(৪) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা

ভারত সংবিধান ৩২নম্বর ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বলা আছে ভারতীয় নাগরিকদের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার গুলি রক্ষা করার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের, অর্থাৎ কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে ভারতীয় নাগরিকরা সুপ্রীমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে এবং সুপ্রীমকোর্ট অধিকার রক্ষার্থে পাঁচ ধরনের নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। যথা (ক) বন্দি প্রত্যক্ষিকরন (খ) পরমাদেশ (গ) প্রতিষেধ (ঘ) অধিকার পৃচ্ছা (ঙ) উৎপ্রেষন। তবে জাতীয় জরুরি অবস্থা দেশে বলবৎ থাকলে সুপ্রীম কোর্টের এই লেখ জারির ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে যায়।

উপরোক্ত চারটি ছাড়া সুপ্রীমকোর্টের অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যা উল্লেখ করা আবশ্যক, যথা -

(১) সুপ্রীম কোর্ট অভিলেখ আদালত হিসাবে কাজ করে । অর্থাৎ সুপ্রীমকোর্টের রায়সমূহ ভারতে প্রামান্য বলে স্বীকৃত এবং অন্যান্য আদালত রায় প্রদান কালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধাচরন করতে পারে না।

(২) আদালত অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারে।

টিপ্পনী

(৩) সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন মামলার নিজের দেওয়া রায় বা সিদ্ধান্তকে পূর্ন বিবেচনা করতে পারে । যেমন গোলকনাথ মামলায় কেশবানন্দ ভারতীয় মামলার রায় এবং মির্নাভা মিলস্ মামলার রায়ের পুনর্বির্বেচনা করতে দেখা যায়।

(৪) সুপ্রীমকোর্ট স্বীয় কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে পারে।

(৫) সুপ্রীমকোর্ট স্বীয় কার্যকলাপকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে সংসদীয় আইনের সঙ্গে সমতা রেখে নিয়মাবলী প্রনয়ন করতে পারে।

মূল্যায়ন

ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক বলে অভিহত করা হয় । কারণ আইনসভা কত্যক প্রনীত আইন ; রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত আদেশও নির্দেশ ঘোষিত হলে তা অকার্যকর হয়ে যায়। সুপ্রীমকোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতা বলা হয়, এবং এই ক্ষমতা বলে সুপ্রীম কোর্ট। ১৯৫১ সালে ভূমি সংস্কার আইন, ১৬৬৯ সালে ব্যাংক জাতীয়করন আইন ১৯৭০ সালে রাজন্যভাতা বিলোপ আইনকে বাতিল করে । সুতরাং সুপ্রীমকোর্ট সংবিধানেরও অভিভাবক।

১.৩ হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরন (HIGH COURT)

রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট । হাইকোর্ট বয়সে সুপ্রীম কোর্ট থেকে বেশ প্রাচীন। ব্রিটিশ আমলে ১৮৬১ সালে কলকাতা ও বোম্বাই হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ২৯টি রাজ্যের যে ২১টি হাইকোর্ট রয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৮টি সংবিধান গৃহীত হবার পর প্রতিষ্ঠিত । যাই হোক সংবিধানের ২১৫নম্বর ধারায় বলা আছে প্রত্যেক

রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। ১৯৫৬ সালে সংবিধানের সপ্তম সংশোধন করে বলা যায় দুই বা ততোধিক রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকতে পারে । যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কলকাতা হাইকোর্টের অন্তভুক্ত।

টিপ্পনী

গঠন

সংবিধানে হাইকোর্টের বিচারকের সংখ্যা নিদিষ্ট করে দেওয়া নেই। শুধু ২১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি যতজন বিচারপতি প্রয়োজন মনে করবেন ততজন বিচারপতি একটি হাইকোর্টে থাকবে । কাজেই হাইকোর্টের বিচারকের সংখ্যা ৩ জন । এছাড়া, হাইকোর্টে আরও দু-প্রকারের বিচারপতি যথা অতিরিক্ত (Additional) এবং অস্থায়ী (Temporary) বিচারপতি থাকতে পারেন। হাইকোর্টের কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে অথবা বহু বকেয়া মামলা জমে থাকলে রাষ্ট্রপতি ২বছররের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করে থাকেন। অনুরূপভাবে, যদি কোনো বিচারক অনুপস্থিত থাকেন বা কোনো কারনে নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন । তাহলে কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তি অস্থায়ী বিচারক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

নিয়োগ

হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি । নিয়োগকালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল ও রাজ্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঙ্গে পরামর্শ করেন। অবশ্য অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগকালে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অধিক গুরুত্বপূর্ন। মরিস জোন্স বলেন "রাষ্ট্রপতি সংবিধানের বিধান লঙ্ঘন করে রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শের বদলে হাইকোর্টের বিচরকদের নিয়োগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন।

স্থানান্তকরন

ভারতীয় সংবিধানে ২২২ নম্বর ধারায় বলা আছে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি বিচারকদের স্থানান্তরিত করতে পারেন। তবে এই ২২২নম্বর ধারার প্রয়োগ মূলত রাজনৈতিক কারনে দেখা যায় । ১৯৭৫ সালের পর থেকে এই স্থানান্তরকরন ঘটতে থাকে। বহু হাইকোর্টের বিচারকগণ এই নীতির প্রতিবাদ জানান।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৮৮ সালে দেবী সিং তেওয়ারিকে স্থানান্তরিত করে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

যোগ্যতা

হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে তাঁকে ভারতের নাগরিক অবশ্যই হতে হবে এবং (ক) তিনি ভারতের কোনো বিচারবিভাগীয় পদে কমপক্ষে দশ বছর আসীন অথবা (খ) তার কমপক্ষে দশ বছর এক বা একাধিক হাইকোর্ট বিচারকদের মতো হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মতো হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক পছন্দের গুরুত্ব সর্বাধিক।

টিপ্পনী

কার্যকাল ও পদচ্যুত

হাইকোর্টের বিচারকগণ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। অবশ্য কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ন হবার পূর্বে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন অথবা তাঁর মৃত্যু হলে বিচারকের আসন শূন্য হয়। অসদাচরন বা অসামর্থ্যের জন্যও রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হতে হয়। রাষ্ট্রপতি এককভাবে হাইকোর্টের কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন না।

বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা

সংবিধানের ২২১ নম্বর ধারায় রাজ্য হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে নির্দেশ আছে। ২০০৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে বলা হয়েচে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৯০হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতি মাসিক ৮০হাজার টাকা বেতন পাবেন। এচাড়া অন্যান্য ভাতা, পেনশন, গাড়ি, ফোন ইতাদির সুযোগ তাঁরা ভোগ করে থাকেন। সংসদ আইন করে এই ভাতাও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা হ্রাস করতে পারে না। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকেএই বে তন ও ভাতা প্রদান করা হয়।

হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতের সংবিধানে হাইকোর্টের কার্যাবলিও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভারতের হাইকোর্টগুলি বহু পুরাতন। যথা - ১৮৬১ সালে কলকাতা ও

টিপ্পনী

বোম্বাই হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং একই নামে একই স্থানে ভারতের অধিকাংশ হাইকোর্টগুলি বহুদিন অবস্থান করছে। সংবিধান গ্রহণের প্রাক্কালে স্থির হয় যে তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি পূর্ববৎ থাকবে। সংবিধান চালু করার পূর্বে হাইকোর্ট যে ক্ষমতা অধিকারী ছিল বর্তমানেও সেই সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলি পূর্ববৎ থাকবে। সংবিধান চালু করার পূর্বে হাইকোর্ট যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল বর্তমানেও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। একই সঙ্গে সংবিধানের ২২৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সংবিধান এবং উপযুক্ত আইন সভা কতৃক রচিত আইনের সীমার মধ্যে হাইকোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে সংসদ আইন করে এই এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করতে পারে।

(ক) মূল এলাকা

হাইকোর্টের মূল এলাকা সংবিধানের ২২৫ নম্বর ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। তদনুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ই হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের এই ক্ষমতা অপসৃত হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে এই অপসারন রোধ করা হয়। ফলে বর্তমানে হাইকোর্ট মূল এলাকায় রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করে।

(খ) আপিল এলাকা

রাজ্য সীমানার মধ্যে হাইকোর্ট হল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

(১) দেওয়ানি আপিল এলাকা : দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা জজ এবং সহকারী জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। অথবা কোনো অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ বা সহকারী জজ রায় দিলে তার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যায় ।এছাড়া কতকগুলি হাইকোর্টে একজন বিচারপতি কত্যক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করাও যায়। কলকাতা হাইকোর্টে একজন বিচারপতি কতৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করাও যায়। কলকাতা হাইকোর্টে এ ধরনের মামলার বহু নজির আছে।

(২) ফৌজদারি এলাকা : দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দাবরা জজ কোনো ফৌজদারি মামলায় কোনো ব্যাক্তিকে সাত বছরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত করলে সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।

(গ) অধিকার সংক্রান্ত এলাকা

হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় অধিকার রক্ষার জন্য আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। হাইকোর্ট ও মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে বন্দি প্রত্যক্ষীকরন, পরমাদেশ, প্রতিষোধ, অধিকার স্পৃচ্ছা, উৎপ্রেষন লেখ জারি করতেপারে। বস্তুতএক্ষেত্রে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতা অধিক শক্তিশালী ; কারন সুপ্রীমকোর্ট শুধু মৌলিক রক্ষার জন্য লেখ জারি করার ক্ষমতায় বলীয়ান। অপরদিকে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য আইনগত অধিকার বলবৎ করার জন্য লেখ জারি করতে পারে।

(ঘ) আইনের বৈধতাবিচার

রাজ্যের হাইকোর্টগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে এই ক্ষমতা হাইকোর্টের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) অধস্তন আদালত সংক্রান্ত ক্ষমতা

হাইকোর্ট রাজ্যের অধস্তন আদালত গুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। হাইকোর্টের পরামর্শে রাজ্যপাল জেলা জজের নিয়োগ, বদলি বা পদোন্নতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। রাজ্যপাল রাজ্যের অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় নিয়োগেও হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়া রাজ্যের অধস্তন আদালত বিচারাধীন মামলার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের কোনো প্রশ্ন যুক্ত থাকলে হাইকোর্ট মামলাটি স্বহস্তে বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারে।

উল্লিখিত বিধিবদ্ধ ক্ষমতা গুলি ছাড়া আরো কতকগুলি ক্ষমতা হাইকোর্ট ভোগ করে থাকে, যথা (১) হাইকোর্ট রাজ্যের অধস্তন আদালতগুলিতে কীভাবে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র রাখতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে (২) নিজের প্রশাসনিক দপ্তরের পদস্ত কর্মচারীদের নিযুক্তি সংক্রান্ত বিধি প্রনয়ন করতে পারে (৩) হাইকোর্ট আদালত

টিপ্পনী

অবমাননার জন্য দোষী ব্যাক্তিকে শাস্তি দিতে পারে ; (৪) বিচারকার্য কীভাবে সম্পাদিত হবে এব্যাপারে হাইকোর্ট প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন তৈরি করতে পারে ; (৫) রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছাড়া বাকি সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে।

টিপ্পনী

মূল্যায়ন

হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে আদালত রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে স্বীকৃত হলেও সীমাবদ্ধতা এই আদালতের মর্যাদাকে হ্রাস করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

(১) ভরতে বিচারব্যবস্থার অখন্ডতা। রাজ্য বিচার ক্ষমতার শীর্ষে হাইকোর্ট অবস্থান করে না। সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রীমকোর্ট। ফলে হাইকোর্ট প্রদত্ত যে কোন রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট আপিল করা যায়।

(২) হাইকোর্ট গুলিতে অসংখ্য বকেয়া মামলা জমে আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না থাকায় মামলা গুলির নিষ্পত্তি হতে বহু সময় লাগে। ফলে হাইকোর্টের ন্যায়বিচার রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা তা পালন করতে পারে না। ২০০৯ সালে ৩৮ লক্ষ ৭০ হাজার প্রদত্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতের হাইকোর্ট গুলিতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে। অধস্তন আদালত গুলিতে ২০০৮ সালে বকেয়া মামলার সংখ্যা হল প্রায় ২কোটি ৬৪লক্ষ।

(৩) হাইকোর্টগুলির উপর কেন্দ্রিয় সরকারের একচেটিয়া প্রাধান্য বিরাজমান। কারণ বিচারপতিদের নিয়োগ স্থায়ীকরন, পদচ্যুতি, পদোন্নতি, বদলি বা চাকরির শর্তাবলী সব কিছু নির্ধারন করে কেন্দ্রীয় সরকার।

(৪) হাইকোর্টের ভূমিকা যথাযথ পালিত না হবার অন্যতম কারন হল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। অধিকাংশ বিচারপতি এই পৃষ্ঠপোষকতা লাভে লালায়িত। বিচারপতি তুলজা পুরকার বলেন "রাজনৈতিক নেতাদের অভিনন্দন জানানো, মন্ত্রীদের সকল কাজে পুস্পস্তবক নিয়ে রেলস্টেশন বা বিমানবন্দরে সুদীর্ঘকালীন অপেক্ষমানতা, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভের নির্লজ্জ নিদর্শন।

(৫) হাইকোর্ট মামলা পরিচলনা করা অত্যন্ত ব্যায়বহুল। এছাড়া বিলম্বিত রায় দানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় বহু অর্থ ব্যায় করেও সুবিচার পাওয়া যায় না। তাই

সাধারণ মানুষ বিচার বিভাগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

(৬) পরিশেষে দেশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে হাইকোর্ট কার্যত পঙ্গু হয়ে যায়। কারণ ; ঐ সকল মৌলিক অধিকার বলবৎ করার অধিকার থেকে হাইকোর্টকে বঞ্চিত করা যায়।

টিপ্পনী

উপরিক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্ট মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি রায় দিয়েছে যাতে ভারতের শাসন কাঠামো আন্দোলিত হয়েছে। উদাহরন স্বরূপ মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ. কে. গোপালন মামলা অথব এলাহাবাদ হাইকোর্ট শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজনারায়ন মামলার রায় উল্লেখ করা যায়। সুতরাং ভারতের বিচার বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গুলির ক্ষমতাকেস্বীকার করতেই হয়।

১.৪ - লোকপাল (LOKPAL)

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারন জনগণ বিভিন্ন অভিযোগ এনে থাকে এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকারের উচিত এই অভিযোগগুলি কীভাবে দূর করা যায় এবং জনগণের মনে সরকারের কীভাবে আস্থা ফেরানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা। এ বিষয়ে যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান সুইডেনে গঠিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০৯) তা হল Ombudsman . এইশব্দটির অর্থ হল অপর কোনো ব্যাক্তির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। Ombudsman এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যা সরকার সম্পর্কে সাধারন জনগণের অভিযোগগুলি শুদ্ধ তা দূর করার চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এরূপ একটি ব্যবস্থা ফিনল্যান্ডে (১৯০৯) গড়েওঠে। ব্রিটেনে ১৯৬১ সালে আন্তর্জাতিক বিচারক কমিশন 'Whyatt Report' জমা দেন এবং এই প্রতিবেদনের সুপারিশক্রমে ১৯৬৬ সালে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টীয় কমিশনের সচিবালয় গড়েওঠে ও ১৯৬৭ সালে তার কাজ শুরু হয়। ১৯৬২ সালে নিউজিল্যান্ডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিশনের ধাঁচে ওমবুডস্ম্যান ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানটির অনুকরনে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

ভারতীয় সংবিধানেমৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সুপ্রীমকোর্টের তরফ থেকে কিছু লেখ জারি করার নির্দেশআছে ; সেগুলির মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ দূর

টিপ্পনী

করা চেষ্টা করা হয়। এছাড়া সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দূর করার চেষ্টা করাহয়। এছাড়া সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে সাধারন ব্যাক্তিরা বিচারবিভাগের কাছে মামলা করতে পারে এবং সেক্ষেত্রেও অভিযোগগুলি দূর করার পরোক্ষ দায়িত্ব এসে পড়ে বিচার বিভাগের ওপর। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অভিযোগ জানাবার জন্য একজন সংশ্লিষ্ট অধিকারিক থাকেন। ১৯৬৬ সালে জনগণের অভিযোগ জানাবার জন্য একটি নিদিষ্ট অফিস তৈরী হয় যার শীর্ষে Commission for Public Grievances। ১৯৬৭ সালে প্রশাসনিক কমিশন(Administrative Reformr Commission) তাদের প্রতিবেদনের জনগণের অভিযোগ শোনা এবং দূর করার জন্য একটি দ্বিস্তরীয় প্রশাসিক কাঠামোর কথা উল্লেখ করে। যার শীর্ষে রয়েছেন লোকপাল। ব্রিটেন পার্লামেন্টীয় কমিশনের অনুসরনে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। লোকপালের কাছেকেন্দ্র এবং রাজ্যের যে কোন মন্ত্রীর এবং যে কোন অধিকর্তা ও কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যাবে। লোকপালের নীচে রয়েছেন, লোকায়ুক্ত যার কাছে কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যায়। পরবর্তী কালে ৯০ এর দশকে কেবলমাত্র লোকপাল গঠনের জন্য একটি আইন পাশ করা হয়, তারমাধ্যমে লোকপালের কাজের চরিত্র নির্ধারন করা হয়। বলা হয় যে লোকপাল প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং সমস্ত দিক থেকে তাঁর পদমর্যাদা হবে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সমান।

১৯৬৮ এর পর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫ এবং ২০০৮ সালে বিলটি বারংবার উত্থাপিত হয়। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে সরকার বিলটি আইনে রুপান্তরিত করার চেষ্টা করে কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়। ২০১০ সালে লোকপাল বিল সিলেক্ট কমিটির সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকাকালীন অবস্থায় নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। আন্না হাজারের আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষনা করেন যে তিনি ২০১১ এর বর্ষায় অধিবেশনেই এই বিল পেশ করবেন। Jan Lokpal Bill বা Citizen Ombudsman Bill এর খসড়া তৈরী করেছেন শশিভূষন, কিরন বেদী, বিচারক এন. এস. হেগড়ে, অ্যাডভোকেট প্রশান্তভূষন, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে. এম. লিংগ দোহ প্রমুখরা।

নতুন প্রস্তাবিত বিলের বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

(১) কেন্দ্রে লোকপাল এবং রাজ্যে লোকায়ুক্তের প্রতিষ্ঠা।

(২) ক্যাবিনেট সচিব এবং নির্বাচনী কমিশনার দ্বারা লোকপালের তদারকি ; অর্থাৎ সরকারি নিয়ন্ত্রনমুক্ত একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(৩) বিচারক এবং সর্বভারতীয় রাষ্ট্র কৃত্যক আধিকারিকদের দ্বারা বিদগ্ধ, সৎ, স্বচ্ছ লোকপাল নিয়োগ।

(৪) নিয়োগের সময় যথাযথ সাক্ষাৎকারের ব্যবথা এবং পরে গণসমক্ষে পেশ।

(৫) লোকপাল প্রত্যেক মাসে তার দ্বারা বিবেচ্য মামলাগুলি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন এবং ; লোকায়ুক্ত একইভাবে পূর্ববর্তি মাসের মামলার খতিয়ান ও কার্যবিধি প্রকাশ করবেন।

(৬) প্রতিটি মামলার তদন্ত এক বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং দ্বিতীয় বছরে মামলার বিচার হবে ; অর্থাৎ অনধিক দুইবৎসরের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি হবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যাক্তি সরকারের ক্ষতি পূর্ন করবে।

(৮) কোনো নাগরিক যদি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি পরিষেবা না পায় ; তাহলে লোকপাল সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে পারে।

(৯) লোকপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ একমাসের মধ্যে তদন্ত হবে এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে দুই মাসের মধ্যে তাকে অপসারন করা হবে।

(১০) CVS (Central Vigilance Commission) এবং CBI (Central Bureau of Investigation) লোকপালের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে কোনো অধিকর্তা, বিচারক ও রাজনৈতিক নেতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করবে।

ভারতে লোকপালের কথা ও ওম্বাগসম্যান ধাঁচেই ভাবা হয়েছিল। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন লোকপাল সম্বন্ধে সুপারিশ করে যে এঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাবে না। সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতোই এর মর্যাদা হবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে ইনি মুক্ত থাকবেন, এঁর নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

থাকবে, আর্থিক লেনদেনের কাজে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে না। লোকপাল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কত্যক নিযুক্ত হবেন এবং বিচারকদের যেভাবে অপসারন করা যেতে পারে তাঁকেও সেইভাবেই অপসারন করা যাবে। যদিও পুনরায় নিয়োগের সুযোগ থাকবে।

১৯৭৭ সালের লোকপালবিল প্রায় সুপারিশ ক্রমেই তৈরী হয়েছিল। ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালে এর পর কিছু পরিবর্তন সহ বিল পেশ হয়। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ও এযাবৎ প্রস্তুত বিলগুলির ভিত্তিতে লোকপালের কাজের কয়েকটি বিশেষত্ব চিহ্নিত করা যায়-

- প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা ; এমনকি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্যমন্ত্রী ও সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যমন্ত্রী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লোকপালের কাছে অভিযোগ করা যায়।
- সরকারি কর্মচারি ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যাক্তির অভিযোগ গ্রহণের সময়ে নিজের সুবিবেচনা অনুযায়ী কাজ করা।
- অভিযুক্ত অধিকর্তা বা কর্মীকে অভিযোগ সম্বন্ধে জানানো ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া এবং তদন্তের প্রয়োজনে যে কোনো তথ্য চাওয়া।
- নিরপেক্ষভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানো ; পাঁচবছরের পুরানো অভিযোগও লোকপাল গ্রহণ করতে পারেন।
- তদন্তের গোপনীয়তা বজায় রাখা
- সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে তদন্ত শেষে প্রতিকারের সুপারিশ করা ও প্রতিকার করা হলে অভিযোগকারীকে জানানো।
- লোকপালের কাজে বিচারবিভাগও হস্তক্ষেপ করে না। লোকপালের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হয় এবং তারপর ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যসহ তা পার্লামেন্টে পেশ করা হয়।

লোকপাল নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, প্রতিরক্ষা, বিদেশি আইন, আন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। কোনো ব্যাক্তির নিয়োগ,

বদলি, অপসারন, বেতন, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি বা কোনো সম্মান বা পুরস্কার সংক্রান্ত কোনো বিষয়াদি, বৈদেশিক সম্পর্ক, বিদেশনীতি, সংক্রান্ত বিষয় লোকপালের এক্তিয়ার বহির্ভূর্ত।

লোকপাল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবেন এই প্রত্যাশা থেকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বিচারকদের মধ্যে থেকে লোকপাল ও তাঁর অফিসের অপর আধিকারিক নিযুক্ত হবেন।

তাঁর বেতন ও ভাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুজনের বেতন ও ভাতা বিচারকের সমান হবে।

লোকপালের বিবেচনাধীন আছে এমন কোনো কেস লোকপালের পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে না।

লোকপাল নিজস্ব সচিবের সাহায্যেকাজ করবেন। শাসন বিভাগীয় সাহায্যের ওপর তিনি নির্ভর করে না।

লোকপাল সম্পর্কিত প্রাথমিক আইন গড়ে তোলা হলেও লোকপাল প্রতিষ্ঠানটি ভারতে তেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। বিভিন্ন ধরনের সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সাধারন জনগণকে বিচারবিভাগের সাহায্যই নিতে হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনোরকম পদক্ষেপ কার্যকর হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকপাল প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠার সম্ভবনা ছিল।

লোকপাল একটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিণাম। সংসদের পরিপূরক সংস্থা হিসেবেইএর অস্তিত্বকে দলমত নির্বিশেষে মেনে নেওয়া উচিত। লোকপালের স্বাধীনতাও নিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁর ওপর কোনোরকম বাহ্যিক চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১.৫ - অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) 'লেখ' বলতে কী বোঝ?

(২) সুপ্রীম কোর্টের 'মূল এলাকা' কী?

(৩) বিচারপতিদের অপসারন কীভাবে করা হয়?

(৪) লোকাযুক্ত কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) হাইকোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর?

(২) সুপ্রীম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর?

(৩) লোকপাল কী? ভারতীয় সমাজব্যবস্থা লোকপাল কতটা সফল হবে?

১.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) শিউলি সরকার, "ভারতের প্রশাসন" পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১৩

(২) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসনব্যাবস্থা ও রাজনীতি", মিত্রম, কলকাতা, ২০১০.

(৩) M.V. Pylee, "Indian Government and Politic", Asia Publishing House, New Dellhi, 1997.

(8) S. L. Sikri, "Indian Govenment and Politics" Kalyani Publisher, New Delhi , 1999

নির্বাচন কমিশন

টিপ্পনী

২.১ - ভূমিকা

২.২ - গঠন

২.৩ - ক্ষমতা ও কার্যাবলী

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২.১ - ভূমিকা

স্বাধীন ভারতে অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে ৩২৪ নং ধারায় নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা উচ্চারিত হয়েছে। এর লক্ষ্য হল ভারতে অবাধ, শান্তিপূর্ন, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে ভোটদানের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা। সংবিধান প্রনেতাগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি ভোট ব্যবস্থা যথাযথ না হয় তাহলে ভারতে গণতন্ত্র বিফল হতে বাধ্য। সংবিধান প্রনেতাগণ একথাও মেনে করেন যে যদি শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থা নিরপেক্ষতা হারাতে পারে। তাই তারা একটি স্বাধীন সংস্থার উপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে সংস্থা ভারতের নির্বাচন কমিশন নামে খ্যাত। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থার দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য কানাডা সংবিধান অনুসরনে ভারতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে।

২.২ - গঠন

মূল সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commisinior) এবং অন্য কয়েকজন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিতহবে বলে উল্লেখিত হয়। অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা ছিল না।

টিপ্পনী

রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করতেন। সংবিধানে একথাও বলা ছিল যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছাড়া অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই নির্বাচন কমিশনের সভাপতি হিসাবে কাজ পরিচালনা করবেন।

প্রত্যেক সাধারন নির্বাচনের পূর্বে (উপনির্বাচন) নির্বাচন কমিশনকে সাহাযভ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ মতো আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার (Regional Election Commissioner) নিয়োগ করতে পারেন। ১৯৮৪ সালে অষ্টম লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ৬জন আঞ্চলিক কমিশনার - পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিনাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের জন্য নিযুক্ত হন। এদের নিয়োগ হয় নির্বাচনের ৩মাস পূর্বে এবং নির্বাচনের পর ৩মাস পর্যন্ত এঁরা এই পদে অভিষিক্ত থাকবেন। রাজ্য বিধানসভা, রাজ্য বিধান পরিষদ ও রাজ্য থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচনের কমিশনকে এঁরা সাহায্য করে থাকেন।

এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থা যাতে দুর্নীতি মুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষক (Election Observer) হিসাবে নিয়োগ করে থাকেন। এরা সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করে থাকেন এবং এদের মধ্যে ব্যায় পর্যবেক্ষক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন পদাধিকারী।

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (Chif Election Officer) থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে দেবাশিস সেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে বর্তমানে কর্মরত (২০০৯)। ১৯৬৬ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে প্রত্যেক জেলার জেলা সমাহর্তাকে জেলা নির্বাচন আধিকারিক (District Election Officer) হিসাবে নিয়োগ করার সংস্থান আছে।

২.৩ - নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতীয় সংবিধানের নবির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদ বাখ্যা নেই। শুধু তার মুখ্য দায়িত্ব সম্পর্কে ৩২৪ (১) নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে।

প্রথমত

সংসদ, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলির

তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যাস্ত। সুতরাং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কমিশনকে কতকগুলি কার্য সম্পাদন করতে হয়। এছাড়া জনপ্রতিনিধি আইন অনুসারে নির্বাচন কমিশনের উপর কতকগুলি কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব বর্তেছে এবং সবশেষে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের রায় অনুসারেও নির্বাচন কমিশনকে কতকগুলি কার্যম্পাদন করতে হয়। জে. সি. জোহারির অনুসারে সংক্ষেপে এই কার্যাবলি উল্লেখ করা হল-

টিপ্পনী

(ক) সংসদীয় বা রাজ্য বিধানসভায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা তৈরি করা। এই ভোটার তালিকা তৈরি কালে জনগণকেও নির্বাচন কমিশনকে মাথায় রাখতে হয়।

(খ) সমগ্র দেশে যাতে অবাধ ও স্বাধীন ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থাদির তত্ত্বাবধান করা।

(গ) নির্বাচনের দিন ও সম্পূর্ন নিঘন্ট প্রকাশ করা। নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্র পেশ করা, প্রত্যাহার করা ও মনোনয়ন পত্রের বৈধতা বিচারের দিন নির্ধারন করা।

(ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে অনুরোধ করা।

(ঙ) সুষ্টভাবে নির্বাচন কার্য সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে অনুরোধ করা।

(চ) রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রদান ও প্রত্যাহার এবং নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা। নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে তারও নিষ্পত্তি করা।

(ছ) সংসদ বা রাজ্য আইনসভার কোনো সদস্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া।

(জ) নির্বাচনের সময় জনগণ, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে কী কী আচরন বিধি (Code of Condact) মেনে চলতে হবে তা স্থির করা।

এছাড়া, নির্বাচন কমিশন নিদিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখতে বা বাতিল করতে পারে।

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত

নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নিয়মাবলি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করে থাকে । এদের ব্যায়সংক্রান্ত ও সাধারণ পরিদর্শক অত্যন্তগুরুত্ব পূর্ন । তাঁদের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত

কোনো দল রাজ্য বা জাতীয় দলের মর্যাদা ভোগ করবে কিনা তা নির্ধারন করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের পুর্ববর্তী নির্দেশ অনুসার ২০০০ সালে সি. পি. আই (এম) জাতীয় দলের মর্যাদা হারালো তৎপর সি. পি. আই (এম) এর আবেদনক্রমে জাতীয় দলের মাপকাঠিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটায়। অনুরূপ কোন দল রাজ্য দল হবে কিনা তার মাপকাঠিও নির্বাচন কমিশন স্থিরকরে।

চতুর্থত

নির্বাচন প্রার্থীর সততা স্থির করার জন্য হলফনামার বয়ান নির্বাচন কমিশন স্থির করে এবং প্রতিটি প্রার্থীকে নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন আধিকারিকের কাছে হলফনামা পেশ করতে হয়।

বস্তুত নির্বাচন কমিশন যাতে নিরপেক্ষভাবে কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য কতকগুলি সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা -

(ক) রাষ্ট্রপতি বা শাসকদল ইচ্ছামতো মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করতে বা অপসারন করতে পারে না । তাঁকে অসৎ আচরন বা অযোগ্যতার কারনে রাষ্ট্রপতি অপসারন করতে পারেন বটে ; কিন্তু তার পূর্বে সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ কতৃক গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই একমাত্র রাষ্ট্রপতি অপসারনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অনুরূপভাবে নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য কমিশনার এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের রাষ্ট্রপতি অপসারন করতে পারলেও তা অবশ্যই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পরামর্শ বা সুপারিশক্রমেই হতে পারে।

(খ) নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সংবিধানে এই সংস্থায় নিযুক্ত হবার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের বেতন, ভাতা, ও চাকরির শর্তাদি তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিবর্তন করতে পারে না।

(গ) নির্বাচন কমিশনার সদস্যদের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। পার্লামেন্ট কতৃক পূর্বনির্ধারিত বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভারতে সঞ্চিত তহবিল থেকে তাঁদের প্রদান করা হয়।

(ঘ) নির্বাচন কমিশনার যাতে তাঁদের কার্যাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে থাকেন।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল গঠনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে পূর্বে নির্বাচন কমিশন যাবতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করত। পরে ১৯৬৬ সাল থেকে আদালতই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত এবং এরূপ একটি সিদ্ধান্ত ছিল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন অবৈধ বলে রায় দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী করে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা আদালতের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয় বলা হয় পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিষ্পত্তি করবে সংসদ বা তার আইন বলে সৃষ্ট কোনো কতৃপক্ষ এবং এও বলা হয় যে এই কতৃপক্ষের রায় সম্পর্কে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলাও যাবে না। যাই হোক ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭৮ সালে জনতা সরকার ৪২ তম সংবিধান সংশোধন থেকে এই আইন বাতিল করে দেয় বর্তমানে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ এবং ঐসব পদাধিকারীর আদালতে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

২.৪ - অনুশীলনী

প্রশ্নাবলী

(১) নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

২.৫ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) রাজশ্রী বসু, "জন প্রশাসন", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ২০১০

(২) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি", মিত্রম, কলকাতা - ২০১০

(৩) অনাদিকুমার মহাপাত্র, "ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি", প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(8) S. L. Sikri, "Indian Government and Politics" Kalyani Publisher, New Delhi-1997

(৫) M. V. Pylee, "Indian Government and Politics", Asia Publishing House, New delhi, 1999

রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

টিপ্পনী

৩.১ - ভূমিকা

৩.২ - কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

৩.৩ - রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

৩.৪ - তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ - ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে শাসন বিভাগ হল সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ন বিভাগ এমনকি গণতান্ত্রিক দেশ গুলিতে দেশের সরকার শাসন বিভাগের প্রধানের নামে পরিচিত হতে দেখা যায়। যেমন বর্তমান ভারতে (২০০৯ সালে) সরকার 'মনমোহন সরকার' নামে অভিহিত। অবশ্য শাসন বিভাগেও দুটি অর্থ আছে (১) ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত সংস্থা যারা আইন রূপায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করে । এই অর্থে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যাক্তি থেকে সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ব্যাক্তিবর্গ যাঁরা আইনকে রূপায়িত করেন তাঁদের সম্মিলিত রূপকে শাসন বিভাগ বলে অধ্যাপক ডাইসির ভাষায় - "প্রধানমন্ত্রী থেকে পুলিশ কর্মচারী সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত - শুধু আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্মীবৃন্দ বাদ।" (২) সংকীর্ণ অর্থে শাসন বিভাগের সংজ্ঞা হল রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা ও প্রধান কর্মসচিবের সচিব বৃন্দের সমষ্টি। রাষ্ট্র পরিচালনায় শেষোক্ত অর্থে শাসন বিভাগ অধিক গুরুত্বপূর্ন। তাই সকল শাসন বিভাগের দুটি অংশ দেখা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে - (ক) রাজ্যনৈতিক অংশ (খ) অরাজ্যনৈতিক অংশ। রাজ্যনৈতিক অংশের অর্থ হল শাসন বিভাগের সেই সমস্ত পদাধিকারী যারা জনগন দ্বারা নিদিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং কার্যকাল শেষ হলে পুনরায় প্রতিদ্বন্দিতা করেন। শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং শ্রী

টিপ্পনী

মনমোহন সিং হলেন শাসন বিভাগের রাজ্যনৈতিক অংশ। অপরদিকে অরাজ্যনৈতিক অংশ হল শাসনবিভাগে সেই অংশ যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যে স্থায়ী ভাবে শাসনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। এরা হলেন শাসন বিভাগের স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ - যথা সচিব, উপসচিব, জেলা সমাহর্তা, জেলা আরক্ষাধীন প্রমুখ।

এরা সরকারী নীতিকে রূপায়িত করেন। এরা সাধারনভাবে আমলা নামে পরিচিত। স্বাধীন ভারতে সংবিধানে রাষ্ট্রকৃত্যক বিভাগ এঁরা যুক্ত হয়েছেন।

৩.২ - কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রকৃত্যক (Civil Service) সম্পর্কে উল্লেখ মেলে। তদানুসারে তিন ধরনের রাষ্ট্রকৃত্যক বিরাজ্যমান। এগুলি হল -

(১) কেন্দ্রীয় কৃত্যক (Central Services)

(২) সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক (All India Service)

(৩) রাজ্য কৃত্যক (State Service)

কেন্দ্রীয় কৃত্যক ও সর্বভারতীয় কৃত্যক নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা হলেন শাসনবিভাগের অরাজ্যনৈতিক অংশ তথা রাষ্ট্রকৃত্যক।S. R. Maheswari এর মতে এ হল - "..... a system of employment maintained by the Government (Central) ..... civil service Which refer to a method of appointing Government employer on the basic of competitive exam." 'ইংলিশ গর্ভনমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকস্' গ্রন্থে রাষ্ট্রকৃত্যক বলতে মনে করেন যে নারীও পুরুষেদের নিয়ে গঠিত এমন এক বিশাল কর্মীবাহিনী যাঁরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পর্যন্ত আইনকে কার্যকর করতে এবং দেশের সাধারন মানুষের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়তে জাতীয় সরকারকে সতত সাহায্য করেন।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে রচিত ভারতীয় বিভিন্ন সার্ভিস এর ঐতিহ্যবাহী। তবে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। তা হল ব্রিটিশ আমলে এই সমস্ত সব ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন ব্রিটিশ স্বার্থের ধারক ও বাহক। এখন তার পরিবর্তে তারা হলেন ভারতীয় শাসক শ্রেনীর স্বার্থরক্ষনকারী। বস্তুত স্বাধীনতার পর

ভারতীয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষনকারী। বস্তুত স্বাধীনতার পর ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকের ভারতীয়করণ ঘটেছে। সংবিধানের ৩০৮ নং ধারা থেকে ৩২৩ নং ধারায় রাষ্ট্রকৃত্যক সম্পর্কে এই বক্তব্যের যথার্থতা মেলে।

৩.৩ - কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION)

টিপ্পনী

ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশদের অধীনে থাকায় ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থায় উৎকর্ষকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে স্বাধীনতা লোভের পর সংবিধান রচনা কালে রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সংবিধানের ৩১৫ নং ধারায় কে্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ও রাজ্য কৃত্যক কমিশনের কথা ঘোষিত হয়।

বস্তুত ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হয়। ১৯২৪ সালে লী কমিশন ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে বলে "Whenever democratic institutor exit. Experience her shown that to secure an efficient civil it is essential to protect it, as far as possible, from political and personal influence and to give it that position of stability and security which is vial to its essential working as the immortal and efficient instrument by which government of whatever complexion may give effect to their policies . এই সমস্ত সুপারিশের প্রেক্ষাপটে ১৯২৬ সালের ১লা অক্টোবর ভারতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠিত হয় । ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের কথা লে। তদনুসারে উক্ত আইনের ২৬৪ নং ধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন

বর্তমানে ভারতীয় সংইধানে ৩১৫নং ধারায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর অবস্থিতি বাধ্যতা মূলক এছাড়া বলা আছে দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি তাদের আইনসভায় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে যে ঐ সব

টিপ্পনী

রাজ্যের একটি যুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠিত হোক। তাহলে সংসদ এই সব রাজ্যের জন্য একটি যুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করতে পারে। আবার ৩১৮ নং ধারায় একথা ও বলা আছে যে কোনো অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন রাষ্ট্রপতি সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট্য রাজ্যের জন্যও কাজ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি এবং ১০ জন সদস্য নিয়ে বর্তমানে (২০০৯ মার্চ) গঠিত হয়। এরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত।নিয়োগপ্রাপ্তির পূর্বে প্রত্যেককে নূন্যপক্ষে ১০ বছর সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে হয় ।বর্তমানে সভাপতি অধ্যাপক ডি.পি .আগরওয়াল উক্ত পদে সমাসীন হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর।তবে ৬৫ বছর পূর্ন হলে আগেই অবসর গ্রহণ করতে হয়।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সদস্যবৃন্দ (সভাপতিসহ) কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতি কোনো সদস্যকে অপসারিত করতে পারেন। ৩১৭ নং ধারায় কী কী কারনে রাষ্ট্রপতি কমিশন সভাপতি বা সদস্য কে অপসারিত করতে পারেন তাও বলা আছে যথা- অসৎআচরন করলে, দেউলিয়া বা অন্য কোনো সংস্থা বেতনভূক্ত কর্মী হলে, মানসিক বা শরীরিকভাবে অসুস্থ হলে অথবা সরকারের সঙ্গে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ থকলে রাষ্ট্রপতি এদের পদচ্যুত করতে পারেন। অবশ্য সার্ভিস কমিশনের কোনো সদস্য বা সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা সুপ্রিমকোর্টের কাছে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাতে হয়। অভিযোগ যথার্থ বলে সুপ্রিমকোর্ট অভিমত প্রকাশ করার পর একমাত্র রাষ্ট্রপতিই তাঁকে অপসারিত করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সংবিধানে কয়েকটি রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল -

(১) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিরপেক্ষতার রক্ষার জন্য বর্ণিত বিশেষ পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে অপসারিত করা যাবে না।

(২) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যরা নিযুক্ত হবার পর তাঁদের স্বার্থের হানি করে চাকরির শর্তাদির পরিবর্তন করা যাবে না।

(৩) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যায় ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হবে। এজন্য সংসদের অনুমোদন লাগবে না।

(৪) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের ভবিষ্যৎ চাকরি সংক্রান্ত কতকগুলি বিধি নিষেধ চলতে হবে। এগুলি হল -

টিপ্পনী

(ক) অবসর গ্রহণের পর কমিশনের সভাপতি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো চাকরি গ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে পুনরায় কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন না। ব্যাতিক্রম হল যে তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি হিসাবে কাজ করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষমতা ও কাযাবলি

সংবিধানের ৩২০ নং ধারায় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলি উল্লেখ আছে। এগুলি হল -

(১) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রধান কাজ হল - কেন্দ্রীয় ও সর্বভারতীয় পদগুলি পূরনের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা এই উদ্দেশ্যে কমিশন লিখিত ও মৌলিক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

(২) দুই বা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করলে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য প্রার্থী বাছাই করার ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য যুক্ত সরকারি কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রনয়ন এবং এসব নিয়মাবলী কার্যকর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে করতে পারে।

(৩) এছাড়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সরকারের কতকগুলি ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকে যথা

(ক) বেসামরিক চাকরি পদসমূহে নিয়োগ পদ্ধতি।

টিপ্পনী

(খ) বেসামরিক পদসমূহে পদোন্নতি বা এক পদন্নোতি ও বদলি প্রার্থীর উপযুক্ত নির্ধারন।

(গ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অধীনে নিযুক্ত কর্মীদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়।

(ঘ) কর্মরত থাকাকালীন আঘাত প্রাপ্তির জন্য বেসামরিক কর্মচারীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা দাবি।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীবৃন্দের বিরুদ্ধে আনীত মামলা মকদ্দমার ব্যায় নির্বাহের বিষয়।

(চ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত অন্য কোনো বিষয়।

অবশ্য সংবিধানে একথাও বলা আছে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন প্রদত্ত পরামর্শ রাষ্ট্রপতি বা সরকার ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ও সর্বভারতীয় চাকরির কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে দিয়ে বলতে পারেন যে এ সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের কমিশনের পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি তপশীল জাতি ও উপজাতি জন্য সরকারি চাকরিতে আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। পরিশেষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারনে রাষ্ট্রপতি যে কোনো বেসামরিক কর্মচারীর পদোন্নতি বা পদচ্যুতি ঘটলেও রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

(৪) ভারতীয় সংবিধানের ৩২৩ নং ধারা অনুসারে কমিশনের রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদনের পেশে করতে হয়। এই প্রতিবেদনে কমিশন কী কী কাজ করেছে, কমিশন সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করেছে বা করেনি, অনুরূপভাবে কমিশন প্রদত্ত পরামর্শ সরকার গ্রহণ করেছে বা করেনি তার উল্লেখ থাকে। এই প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়।

(৫) ভারত সংবিধান বর্ণিত উপরিউক্ত দায়িত্ব কমিশন পালন করে থাকে। এছাড়া সংসদ আইন প্রনয়নে মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যানারে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পন করলে কমিশন তা পালন করে থাকে। যথা কোনো ব্যাক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকার সামরিকভাবে নিযুক্ত করলে এবং এক বছর অতিবাহিত হলে তার

অনুমোদন কমিশন দিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রতি আস্থা বাড়ায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রতিবছর বেড়ে চলেছে। এজন্য একবিংশ শতকে বৈদ্যুতিন মধ্যে তথা ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে কাজের গতি প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। কমিশন সামপেরা প্রকল্পপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য ওয়েবসাইট ব্যবহার কার্যকর করছে।

টিপ্পনী

৩.৩ - রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন

ভারতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের (Union Public Service Commission) ন্যায় অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন থাকার সংস্থান সংবিধানে ৩১৫ নং ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। তবে বলা হয়েছে (১) দুই বা ততোধিক রাজ্য আইনসভা যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য একটি যৌথ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Joint State public Service Commision) থাকবে। তাহলে ঐ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পার্লামেন্ট আইন প্রনয়ন করে ঐ সব রাজ্যের জন্য একটি যৌথ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করতে পারে । অথবা (২) কোনো অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য কাজ করতেও পারেন। অবশ্য এরূপ কাজ সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রপতি পূর্ব সম্মনতি আব্যশক। পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন আছে।

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য ও সভাপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের সদস্য সংখ্যাও চাকরির শর্তাবলি রাজ্যপাল কর্তৃক স্থির হয়। তবে যৌথ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক গঠিত হলে আর সদস্য ও সভাপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন (৩১৬ নং ধারা) । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাষ্টকৃত্যক কমিশনের সভাপতি সহ সদস্যরা রাজ্যপাল কর্তৃক বর্তমানে নিযুক্ত।

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা আছে যে কমিশন সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক সদস্যকে অন্তত ১০ বছরের সরকারি কর্মচারী হিসাবে কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে ৬২ বছর পূর্ন হলে তাঁকে পূর্বের অবসর গ্রহণ করতে হয়। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারে। কেন্দ্রীয়

টিপ্পনী

রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের যে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদেরও তিনি অপসারণ করতে পারেন। সংবিধানের ৩১৭ নং ধারায় বলা আছে -

(ক) যদি কোনো সদস্য দেউলিয়া হয়ে পড়েন।

(খ) যদি তিনি তাঁর অফিসের বাইরে অন্য কোনো অর্থকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত হন।

(গ) যদি রাষ্ট্রপতির মতে মানসিক ও শারিরীক ভাবে কাজের অযোগ্য বলে বিবেচিত হন তাহলে তাকে পদচ্যুত করা যাবে।

এছাড়া রাজ্যপাল কোনো রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারেন। অসদাচরন অভিযোগের ভিত্তিতে পদচ্যুত করতে হলে বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টের কাছে পাঠাতে হয়। সুপ্রীমকোর্টের বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে অপসারিত করা যায়।

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যদের বেতন ভাতা ইত্যাদি আইনসভা স্থির করে দেয় এবং তাঁরা তা রাজ্য সঞ্চিত তহবিল থেকে পেয়ে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবে এগুলি রাজ্য আইনসভার অনুমোদন লাগে না।

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যবলি

রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অনুরূপ। সংক্ষেপে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলি ও ক্ষমতা তুলে ধরা হল -

প্রথমত

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রধান ও প্রথম কাজ হল রাজ্য সরকারের অধীন পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা। এ উদ্দেশ্যে কমিশন লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত

রাজ্য সরকারের অধীন সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় স্থির করে এবং এ বিষয়ে রাজ্যপাল মতামত চাইলে কমিশন পরামর্শ দিয়ে

থাকে।

তৃতীয়ত

কমিশন প্রতিবছর রাজ্যপালের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন কমিশন তাদের কাজের খতিয়ান উপস্থিত করে। রাজ্যপাল কমিশনের এইপ্রতিবেদন আবার রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার জন্য পেশ করে থাকেন।

টিপ্পনী

চতুর্থত

রাজ্য আইনসভা আইন প্রনয়ন করে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলির সম্প্রসারন ঘটাতে পারে।

সর্বশেষে কমিশন রাজ্য সরকারকে সরকারি কর্মচারীদের নানান বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। যেমন কোনো সরকারী কর্মচারি দোষী সাব্যস্ত হলে কী ধরনের শাস্তি মূলক ববস্থা নেওয়া উচিত অথবা কর্মরত থাকাকালীন কোনো কর্মচারী আঘাত প্রাপ্ত হলে তাকে কী ধরনের ক্ষতিপূরন দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে থাকে । প্রসঙ্গত উল্লেখ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন প্রদত্ত রাজ্য সরকার সাধারনভাবে গ্রহণ করে থাকে এবং যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে তা রাজ্য বিধানসভায় ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ব্যবস্থাদি

রাজ্য সরকারে উৎকর্ষ অনেকাংশ রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের উপর নির্ভর করে। কারণ সঠিক কর্মী বাছাই ও নিয়োগ করতে না পারলে তাদের কাছে হাতে অনুগত্য পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কাজ পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক ভাবে এই সংস্থা নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা থাকা দরকার। ভারতের সংবিধান কমিশনের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(১) সংবিধানে বর্ণিত নিদিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনর সদস্য বা সভাপতিকে অপসারণ করা যাবে না।

(২) কমিশনের সভাপতি ও সদস্যরা যাতে নিরপেক্ষ ভাবে তাদের কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারেন সে জন্য তাঁদের বেতন ও ভাতার জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল

হতে দেওয়া হয়। রাজ্য আইন সভার উপর অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না।

(৩) কমিশনের সদস্যদের চাকরির শর্তাদি স্থির করেন রাজ্যপাল। নিযুক্তির পর তাঁদের স্বার্থহানি করে চাকরির শর্তাবলীতে কোনো পরিবর্তন করা যায় না। ফলে সদস্যরাও নির্ভয়ে কাজ করতে পারেন।

টিপ্পনী

(৪) রাজ্যরাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতিবা সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ন হলে তাঁরা কোনো সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারেন না ; তবে তাঁরা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের বা অন্যরাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা সদস্যপদ নিযুক্ত হতে পারেন।

রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা এযাবৎকাল প্রায় সমালোচনার উর্ধেই ছিল। সম্প্রতি পাঞ্জাব রাজ্যে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এই ধারায় ব্যতয় ঘটিয়েছে। ঐ রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণের দৃষ্টান্ত সমস্ত নিরপেক্ষ মানুষকে ব্যাথিত করে। বস্তুত ভোগবাদী সমাজের করাল গ্রাস থেকে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে অব্যাহতি দেয়নি।

৩.৪ - তপশলিজাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে ষোড়শ অংশে তিনটি পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু তথা তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায় সমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানে অবশ্য তপশীল জাতি ও উপজাতির স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। শুধু বলা হয়েছে তপশিলী জাতি বংশ বা উপজাতি অথবা ঐসব জাতি বংশ বা উপজাতির কোনো অংশ বা গোষ্ঠিকে বোঝাবে রাষ্ট্রপতি যাদের সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'তপশিলী জাতি' বলে অন্তর্ভুক্ত করবেন। তবে সংসদ আইন বলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিজ্ঞাপিত তপশিলী জাতির মধ্যে কোনো জাতিকে অন্তরভুক্ত করতে বা বাদ দিতে পারে। তবে কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ ঘোষণায় রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

তপশিলী উপজাতিল সেই সব উপজাতি বা উপজাতি ভুক্ত বা তাদের কোনো অংশ বা গোষ্ঠী যাদের রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'তপশিলী উপজাতি' বলে অন্তভুক্ত করবেন। এক্ষেত্রেও ঘোষণার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের

সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় (৩৪২নং ধারা) সংসদ আইন প্রনয়নের দ্বারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত উপজাতির তালিকা হতে কোনো উপজাতি, বংশ বা জাতিকে বা তাদের কনো অংশ বা গোষ্ঠিকে অন্তরভুক্ত করতে বা বাদ দিতে পারে।

ভারতের সর্বশেষপ্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে (২০০১) মোট জনসংখ্যা ছিল ১০২,৮৭,৩৭,৪৩৬ জন। তন্মধ্যে ১,৬৬,৫৩৬ হাজার জন তপশিলী জাতিভুক্ত তথা মোট জনসংখ্যার ১৬.২০% এবং ৮৪,৩২৬ হাজার জন তপশিলী উপজাতিভুক্ত তথা মোট জনসংখ্যার ৮.২০% অর্থাৎ ভারতের মোট জনগনের ২৪.৪০ % মানুষ হল তপশিলী জাতি ও উপজাতি অন্তরভুক্ত । এই বাপক সংখ্যক তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য যেসব বিশশেষ সুযোগ সুবিধা তথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা একে একে বর্ণিত হল -

টিপ্পনী

আইনসভায় আসন সংরক্ষণ

তপশিলী জাতি ও উপজাতির মানুষেরা যাতে আইনসভা তথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক কক্ষে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের কথা বলা আছে। বর্তমানে লোকসভায় তপশিলী জাতিদের ৭৯টি ও উপজাতিদের ৪০ টি আসন সংরক্ষিত।

মূল সংবিধানে আইন সভার আসন সংরক্ষণ প্রথমে ১০ বছর জন্য বলবৎ ছিল, পরে সংবিধানে সংশোধন করে ২০১০ সালের ২৫জানুয়ারি পর্যন্ত এই সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে তপশিলী জাতি ও উপজাতি মানুষদের সাধারন আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দিতা করে জয়জুক্ত হতে কোনো বাধা নেই।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৫ নং ধারায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের কথা বলা হয়েছে । তবে সরকারি চাকরি দানেএই সুযোগ কতদিন বলবৎ থাকবে এ বিষয়ে সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। তাই এটা ধরে নেওয়া যায় যে যতদিন এই গোষ্ঠীর জনগন আর্থিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনান্য ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির সমপর্যায়ভুক্ত

না হচ্ছে ততদিন চাকরি ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

বর্তমানে সরকারি চাকরির ১৫% তপশিলী জাতি ৭.৫% উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা সরকার ঘোষণা করেছে। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ কেন্দ্রীয় সরকারি পদে স্থায়ী লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশিলীজাতি ও উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নিয়োগ করার কথাও বলা হয়ছে। পরিশেষে ১৯৯০ সাল থেকে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেনীর জন্য (OBC) সরকারি চাকরির ২৭% সংরক্ষিত থাকবে বলে ঘোষিত হয়েছে। সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতির আরও দুটি অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। (ক) চাকরির প্রদানের যে বয়ঃসীমা ধার্য আছে সেক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের বয়ঃসীমা ৫বছর শিথিল যোগ্য এবং (খ) যোগ্যতা নিরুপনের জন্য ন্যূনতম নম্বর পেতে হয় সেক্ষেত্রে এরা বিশেষ ছাড় পেয়ে থাকে।

টিপ্পনী

শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ

তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি এবং সামাজিক পশ্চাৎপদ শ্রেনীর ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষায়তনে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ পায় তার সংস্থান সংবিধানে ১৫(৪) ধারা ২৯(২) নং ধারা গুলিতে তপশিলী জাতির জন্য ২২% ও তপশিলী উপজাতির জন্য ৬% আসন সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা আছে । অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সাধারন কলেজে ও এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর আছে। এছাড়া তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির ছাত্রছাত্রীরা পাঠরত অবস্থায় বিশেষ আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ

তপশিলী জাতিও উপজাতির ব্যবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৩৮ নং ধারানুসারে একজন আধিকারিক নিয়োগ করতে পারেন। ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম এ ধরনের একজন আধিকারিক নিযুক্ত হল - তিনি তপশিলী জাতি ও উপজাতি কমিশনার নামে খ্যাত ছিলেন। এই পদকে পুনর্গঠন করা হয় ১৯৬৭ সালে । তখন হতে সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে একজন ডিরেক্টর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে তপশিলী জাতি ও উপজাতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকেন।

কমিশন নিয়োগ

ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৮ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধূষিত রাজ্যগুলি তপশিলী অঞ্চল সমূহের প্রশাসন ও তপশিলী উপজাতির কল্যাণ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিশন গঠন করতেপারেন। সংবিধান কার্যকরহবার১০ বছরের মধ্যে এ ধরনের কমিশন গঠন করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য বলে সংবিধানে উল্লেখিত হয়েছে । তদনুসারে ১৯৫৩ সালে কাকা কাললেকার কমিশন বা ১৯৭৩ সালে বি. পি. মন্ডল কমিশন গঠিত হয় । বর্তমানে (১৯৯৯ সাল থেকে) তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠিত হয়েছে।

উপজাতি কল্যান মন্ত্রী

সংবিধান১৬৪ (১) ধারায় অনুসারে ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড় তপশিলী জাতি ও উপজাতির কল্যান সাধনের জন্য একজন করে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাখার কথা বলাআছে। এই মন্ত্রীরা তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যান সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি জ্ঞাত করে থাকেন।

বিশেষ আর্থিক সাহায্য দান

সংবিধান ২৭৫ নং ধারায় অনুসারে তপশিলী উপজাতিদের উন্নতি বিধানের জন্য রাজ্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যায় বহন করে থাকে। এছাড়া তপশিলী অঞ্চলসমূহের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য ও দিয়ে থাকে। ১৯৭৯-৮০ সালে তপশিলী জাতিসমূহের সামগ্রিক বিকাশের জন্য যে বিশেষ সাহায্য দান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

যাতাযাত ও বসবাসের ক্ষেত্রে সুযোগ

সংবিধানের ১৯(৩) ও (৫) ধারা অনুসারে প্রতিটি নাগরিক ভারতের যে কোন স্থানে যাতায়াত ও বসবাস করার অধিকার ভোগ করেন । এ ক্ষেত্রে তপশিলী উপজাতিদের একটি বিশেষ সুযোগ হল এই যে তারা সেখানে বসবাস করে সেখানে অন্য জাতির গমনাগমন সরকার আইন করে নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাংশে লোধা উপজাতিবসবাস করে । সেই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এলাকায় (বিদেশী) লোধা উপজাতি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায় বসবাস করার অধিকারী নয়। কারন ঐ অনগ্রসর উপজাতিদের সংরক্ষণ ঐ অঞ্চলে সরকারের বসবাস করার অধিকারী নয়। কারন ঐ অনগ্রসর উপজাতিদের সংরক্ষণ ঐ অঞ্চলে সরকারের বসবাসর ক্ষেত্রে যুক্তি সঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে।

ভারতে পশ্চাৎপদ শ্রেনীর জন্য সংরক্ষণ থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে। কেউ কেউ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবলুপ্তি দাবি করেন এবং তাঁরা বলেন -

(১) তপশিলীী সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে সুযোগ সুবিধা পায় তাকে তাদের জন্মগত অধিকার বলে ধরে নিয়েছে। তাই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রদ করা আব্যশক মনে হয় বা যা থাকা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈতিক, তাকে বজায় রাখার জন তপশিলীী সম্প্রদায়ের লোকেরা আন্দোলন করে থাকে। এই মানসিকতা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে বিপদ হতে পারে।

(২)পশ্চাৎপদতার ভিত্তি হল মূলত জাতিগত এই জাতিগত ভিত্তি থাকার ফলে একই জাতির যারা অনগ্রসর এবং যারা অগ্রসর তাদের মধ্যে ফারাক টানা কষ্টকর। বেশ কিছু তপশিলী পরিবার আছে যারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ অথচ তারা ঐ পরিবারে জন্মেছে বলে সব কিছু সুযোগ - সুবিধা লাভ করে থাকে।

(৩) পাঁচ দশকের বেশি এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে অব্যাহত আছে। কিন্তু তার ফলে অভিপ্রেত আর্থ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়নি। আজও দেখা যায় বহু সংরক্ষিত পদ পূরণ হচ্ছে না, স্কুল সার্ভিস কমিশন বা কলেজ সার্ভিস কমিশন বহু সংরক্ষিত পদকে এস. সি / এস. টি থেকে জেনারেল পদে রূপান্তরিত করার জন্য আবেদন করছে।

(৪) কিছু কিছু পদ আছে যেখানে মেধাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় বিচক্ষনতা নৈপুন্য, দক্ষতা ইত্যাদি পরিবর্তে শুধু জাত পাতকে প্রাধান্য দিতে হয়। ফলে তা দেশের সামগ্রিক বিকাশকে প্রতিহত করে।

(৫) ভারতে সমাজের পশ্চাৎপদ্তাকে রাজ্যনৈতিক সুবিধালাভের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ রাজ্যনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাকে রক্ষা করার কৌশল হিসাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে থাকে।

(৬) বহু সময় ধরে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকলে উচ্চজাতির মেধাবী ব্যাক্তিরা বঞ্চিত হন। পরিবর্তে নিম্নজাতির নিম্নমানের ব্যাক্তিরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। ফলে দেশের সামগ্রিক মান নেমে যায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিরোধ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

তবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকা আবশ্যক। কারন এখনও বহু মানুষ আজও যাদের অবস্থা অবর্ননীয়। তারা সরকারের সাহায্য বা সমর্থন না পেলে কোনো দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বর্তমান আর্থ সামাজিক কাঠামোয় যারা সবার নিচে বা সবার পিছনে তাদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে হলে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা জরুরি। তবে সংরক্ষণে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনগ্রসরতা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বস্তুত আমাদের মতো দরিদ্র দেশে অনগ্রসরতা বা পশ্চাৎপদতা মাপকাঠি জাতিভিত্তিক না হয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। দক্ষিন ভারতে ব্রাহ্মণরা বর্ণ শ্রেষ্ঠ হয়েও আজ দারিদ্রতার কারণে তপশিলী জাতি হতে আগ্রহী।

টিপ্পনী

৩.৫ - অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর?

(২) রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন কিভাবে গঠিত হয়?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

(২) রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

(৩) ভারতীয় সংবিধানে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

৩.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) রাজ্যশ্রী বসু, "জনপ্রশাসন", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১০

(২)শিউলি সরকার, "ভারতের প্রশাসন", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা -

২০১২

(৩) হিমাংশু ঘোষ, "ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্যনীতি", মিত্রম, কলকাতা- ২০১০

(8) S. KL. Sikri, "Indian Government and Politics":, Kalyani Publisher, New Delhi - 1997.

টিপ্পনী

ত্রিপুরার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

টিপ্পনী

৪.১ - ভূমিকা

৪.২ - গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

৪.৩ - ত্রিপুরার পৌর শাসন

৪.৪ - ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (TTAADC)

৪.৫ - অনুশীলনী

৪.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ - ভূমিকা

মূল ভারতীয় সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না কেবল নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে পঞ্চায়েতে ব্যবস্থা রূপায়নের ইঙ্গিত ছিল। ১৯৫৭ সালে বলবন্তরাই মেহেতার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তথা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পক্ষে রায় দেয়। মেহেতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ায় ১৯৭৭ সালে অশোক মেহেতা কমিটি, ১৯৮৫ সালে জি. ভি. কে. রাও কমিটি এবং ১৯৮৬ সালে এল. এম. সিংভী কমিটি গঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন রাজ্যের এক্তিয়ার ও কাজের এলাকা সঙ্কুচিত হচ্ছে এরকম নানা সমালোচনা বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯২ সালে ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার গঠন, নির্বাচন - বিষয়ক বক্তব্য সংবিধানের একাদশ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত।

৪.২ - ত্রিপুরার গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা (Rural Government in Tripura)

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগে দেশীয় রাজ্য ছিল,

টিপ্পনী

যেখানে উপজাতি প্রথার উপর ভিত্তি করে পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজস্ব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নানারকম সিদ্ধান্ত গ্রহন করত। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীরা এইসব গ্রাম পরিষদগুলিতে অংশগ্রহন করত না। ১৯৫০ এর দশকের বামপন্থী আন্দোলনের কারণে বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের সূচনা হতে থাকে। ১৯৬২ সালের মে মাসে প্রথম বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জিরানিয়া অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত (Gaon Panchayet) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৭ সালের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি ৪৬৭ টি গ্রামসভা গড়ে ওঠে। এছাড়া এই সময় ১৩৮ টি ন্যায় পঞ্চায়েত ও গঠিত হয়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় এক স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা করে। এই সময় ত্রিপুরা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি আইন পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভোট দেবার ন্যূনতম ববস ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয় এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হয়। ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন' কার্যকর হয়। তবে এই আইন "ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলাপরিষদ" (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council) সমূহে কার্যকর হবে না। বর্তমানে ত্রিপুরা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত।

(১) জেলা পরিষদ (Zilla Parishad)

জেলা পরিষদ হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। পৌরসভা, বিজ্ঞাপিত এলাকা ও সৈন্যাবাস এলাকাকে জেলাপরিষদদের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ৮ টি জেলাপরিষদ বিদ্যমান।

গঠন

জেলা পরিষদেরসদস্যরা জনগণ কতৃক সরাসরি নির্বাচিত হন। কিছু পদাধিকার বলে সদস্য থাকার তিন ধরনের সদস্য দেখা যায় - জেলার প্রতিটি সমিতি বা ব্লক এলাকা থেকেনির্বাচিত সদস্য, পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিবৃন্দ এবং জেলা বা জেলার কোন অংশ থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যবৃন্দ এবং জেলায়বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণ। জেলাপরিষদে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষন এবং অসংরক্ষিত আসনের এক

তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

কার্যকাল

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মতো জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। চরিত্রহীনতা ও ফৌজদারি অপরাধের জন্য ৬ মাসের বেশী কারাদন্ডে দন্ডিত হলে বা জেলা পরিষদের সদস্য পদের মৌল যৌগ্যতা হারালে বা একাধিকক্রমে জেলা পরিষদের তিনটি সভার অনুপস্থিত থাকলে জেলা পরিষদের সদস্য পদের অবসান ঘটে।

টিপ্পনী

সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি

নির্বাচনের পর জেলা পরিষদের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাধিপতি ও একজন সহকারি সভাধিপতি নির্বাচিত করেন। পদাধিকার বলে সদস্যপদ অর্জনকারি কোনো সদস্য সভাধিপতি বা সহকারি সভাধিপতি হতে পারেন না। সভাধিপতি হলেন জেলা পরিষদের সর্বোচ্চ কতৃত্বসম্পন্ন পদাধিকারী সুতরাং জেলাপরিষদের সকল কর্মচারী নিয়োগও তাদের কাজের তদারক, আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার তাকেই বহন করতে হয়।

সভা

প্রতি তিনমাসে কমপক্ষে একবার জেলা পরিষদের সভাআহ্বান করা হবে। এই সভার সভাপতিত্ব করবেন সভা উপস্থিত সদস্যগনের মধ্যে থেকে একজনকে ঐ সভার সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

কার্যাবলী ও ক্ষমতা

গ্রামপঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে প্রায় অনুরূপ কার্যাবলী জেলা স্তরে জেলা পরিষদ সম্পাদন করে থাকে। জেলা পরিষদ পাঁচ বছরের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে এবং প্রত্যেক বছরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহন করে পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা গুলিকে রূপায়িত করে। জেলা পরিষদের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হল -

(১) কৃষি, পশুপালন. শিল্পাদি, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীন ঋন, জল সরবরাহ,

টিপ্পনী

সেচ, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসালয়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহন ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

(২) রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িতকরা।

(৩) জনহিতকর কার্য পরিচালনা করা।

(৪)বিদ্যালয়, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও লোকহিতকর সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা।

(৫) প্রযুক্তি শিক্ষা বা অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

(৬) গ্রামীন হাট ও বাজারগুলি পরিচালনা করা।

(৭) গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে আর্থিক অনুদান।

(৮) আর্তদের ত্রানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(৯) জেলার পঞ্চায়ের সমিতিগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয় গঠন করা।

(১০) জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আয়-ব্যায়ের হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন।

আয়ের উৎস

জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান উৎসগুলি হল - কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতৃক ভূমি রাজস্বের অংশ, কেন্দ্রীয়ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত ঋন, পথ কর, পূর্ত কর, সম্পত্তি কর, জরিমানা বাবদ কর ইত্যাদি। তবে জেলা পরিষদের বার্ষিক আয় ব্যায়ের হিসেব রাজ্য সরকার কতৃক অনুমোদিত হতে হয়। রাজ্য সরকার বাজেটের কোনো অংশের পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ ও করতে পারে।

(২) পঞ্চায়েত সমিতি

১৯৯৩ সালের ত্রিপুরা পঞ্চাবেত আইন অনুযায়ী ত্রি-স্তরীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় হল পঞ্চায়েত সমিতি। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতি বিদ্যমান।

গঠন

১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন অণুসরে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগন জনগণ কতৃক সরাসরি নির্বাচিত হন, আবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে বা পঞ্চায়েতসমিতির কোন অংশে বসবাসকারী আইনসভার সদস্যরাও পঞ্চায়ের সমিতির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। আবার সংশ্লিষ্ট ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরাও পদাধিকার বলে সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন।

টিপ্পনী

কার্যকাল

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা মহাকুমা শাসকের হাতে নিয়োজিত। চরিত্রহীনতা এবং ফৌজদারি অপরাধের জন্য ৬মাসের বেশী কারাদন্ড ভোগ করে থাকলে বা বিনা অনুমতিতে পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে বা দেউলিয়া, বিকৃত মস্তিস্ক ইত্যাদি বলে প্রমানিত হলে পঞ্চায়েত সমিতির যেকোনো সদস্যকে পদচ্যুত করা যায়।

সভাপতি ও সহকারি সভাপতি

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবন্দ নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহকারি সভাপতি নির্বাচন করে। ব্লক স্তরে এরাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন ব্যাক্তিত্ব ও প্রশাসনিক প্রধান। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (B.D.O) পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন।

সভা

বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে ২মাস অন্তর একটি করে সভা আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। সভার স্থান, তারিখ ও সময় আগে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়। প্রতি সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারি সভাপতি সভার কাজ পরিচালনা করেন। উভয়েই অনুপস্থিত থাকলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

ক্ষমতাও কার্যাবলী

নবপর্যায়ে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত

টিপ্পনী

আইনে বর্ণিত হয়। সেই অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলী হল -

(১) কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প,সমবায় আন্দোলন, গ্রামীন বন, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসালয়, যোগাযোগ, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(২) রাজ্য সরকার কতৃক আরোপিত যে কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবাবিত করা।

(৩) যে কোনো জনহিতকর কার্য পরিচালনা করা বা পঞ্চায়েত সমিতির অধিনস্থ যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালনা করা ল

(৪) পঞ্চায়েত অধিনস্থ যে কোনো বিদ্যালয়, জনপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণকর সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা।

(৫) জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান দেওয়া।

(৬) রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কোনো পৌরসভা থাকলে জলসরবরাহ বা মহামারি প্রতিরোধে গৃহিত ব্যবস্থাদি বাবদ ব্যায় করা।

(৭) আর্তদের ত্রানের জন্য ব্যবস্থা করা।

(৮) পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় গঠন করা।

(৯) পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করা।

এছাড়া জেলাপরিষদ বা রাজ্য সরকার আরোপিত নানাবিধ কার্যাবলী ও পঞ্চায়েত সমিতি করে থাকে।

আয়ের উৎস

উপরিউক্ত কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের উৎস নির্ধারিত করা হয়েছে। সেগুলি হল -

যানবাহনের ওপর ধার্য কর, রেজিস্ট্রেশন ফি, হাট ও বাজারের ওপরে ধার্য লাইসেন্স ফি, জল ও রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য ধার্যকর ইত্যাদি। এছাড়া কেন্দ্রীয়

সরকার, রাজ্যসরকার ও জেলা পরিষদ থেকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েত

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কোনো একটি মৌজা বা তার অংশ অথবা পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি মৌজার সমষ্টি বা তাদের অংশসমূহকে নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হবে। রাজ্য সরকার প্রতিটি 'গ্রামের' জন্য গ্রামের নামানুসারে 'গ্রামপঞ্চায়েত' গঠন করে।

টিপ্পনী

গঠন

যে সব গ্রামবাসী বিধান সভার ভোটদাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত তারা গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত করতে পারে। ত্রিপুরার বিধানসভার ভোটদাতারা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচিত করতে পারবে এবং অণাধিক পনেরো এবং সর্বনিম্ন নয় নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এর সদস্য সংখ্যা কত হবে তা ত্রিপুরা সরকার নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থির করে দেবেন। পঞ্চায়েত আইনে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে।

কার্যকাল

১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। একবার গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হলে তাকে ঐ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারিত করার ক্ষমতা গ্রামপঞ্চায়েত বা ভোটদাতাদের নেই। শুধুমাত্র মহকুমা শাসক তাদের বিভিন্ন কারনে অর্থাৎ ফৌজদারি দন্ডবিধিতে দন্ডিত হলে বা পরপর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত হলে অথবা প্রদেয় কর বা ফি না দিলে অপসারিত করতে পারেন।

প্রধান ও উপপ্রধান

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ থেকে একজন প্রধান ও একজন উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এঁরাই এই স্তরের সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান প্রধানের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেন। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রধান ও উপপ্রধান নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে থাকেন।

টিপ্পনী

গ্রামসভা

প্রতিমাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের নূন্যতম একটি বৈঠক আহ্বান করতে হয়। এই মাসিক বৈঠক ছাড়া 'তলবি সভা' আহ্বানের ব্যবস্থাও আছে। এক তৃতীয়াংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হয়। প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান এবং তাঁর অনুপস্থিতি উপপ্রধান। ভোট গ্রহনের সময় কোনো প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি একটি নির্নায়ক ভোট দিতে পারেন। তবে প্রধান বা উপপ্রধানকে অপসারিত করার জারির ভিত্তিতে আহুত সভায় সভাপতির কোনো নির্নায়ক ভোট থাকে না।

ক্ষমতাও কার্যাবলী

তৃনমূল পর্যায়ে গ্রামীন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আবর্তিত হয় এবং সেই কারণে বহুবিধ কাজের দায়িত্ব এই সংস্থার ওপর বর্তায়। সেই অনুসারে গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, অন্যান্য কর্তব্য এবং ইচ্ছাধীন কর্তব্য।

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(১) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষন, ময়লা নিস্কাশন, জল নিস্কাশন ও অপরিচ্ছন্নতা নিবারণ করা।

(২) ম্যালেরিয়া, গুটি বস্ত, কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী নিবারণের ব্যবস্থা করা।

(৩) পানীয় জল সরবরাহ, জলাধার পরিস্কার ও তা জীবানুমুক্ত করা।

(৪) জলপথ সংরক্ষন, মেরামত ও নির্মান করা।

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন ঘরাবাড়ির ও সম্পত্তির সংরক্ষন বা মেরামত করা।

(৬) সমাজ ও অঞ্চলের উন্নয়ন কর্ম পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা।

(৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা।

(৮) পঞ্চায়েতের নিজস্ব এলাকাধীন চৌকিদার ও দফাদারদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন করা ইত্যাদি।

অন্যান্য কর্তব্য

রাজ্য সরকার যে সমস্ত কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সমর্থন করে সেই সমস্ত কার্যাবলি অন্যান্য কর্তব্য নামে চিহ্নিত। সেগুলি হল -

(১) প্রাথমিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

(২) গ্রামীন চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি সদন ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করা।

(৩) খেয়াঘাট পরিচালনা করা।

(৪) জলসেচের ব্যবস্থা করে।

(৫) রুগ্ন ও অনাথদের তত্ত্বাবধান করা।

(৬) বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দান।

(৭) গ্রামে সরকারি সাহায্য পৌছে দেবার দায়িত্ব পালন করা।

(৮) পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং সেখানে চাষের ব্যবস্থা করা।

(৯) সমবায় ভিত্তিতে গ্রামের জমি ও অন্যান্য সম্পদ পরিচালনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ইচ্ছাধীন কর্তব্য

যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় পালন করে থাকে সেগুলি ইচ্ছাধীন কর্তব্য রূপে পরিচিত। তবে রাজ্য সরকার এইরূপ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। এই কাজগুলি হল -

(১) জনসাধারনের ব্যবহৃত রাস্তা সমূহের জন্য আলোর ব্যবস্থা করা।

(২) জনপথের ধারে ও অন্যান্য সার্বজনীন স্থানে বৃক্ষরোপন ও বনসৃজন করা।

(৩) কূপ, পুস্করিনী ও দীঘি খনন করা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(৪) বাজার নির্মান, নিয়ন্ত্রন, আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন, মেলা ও হাট বসানো এবং নিয়ন্ত্রন করা।

(৫) সরকারী ঋনপ্রাপ্তি,বিতরন এবং পরিশোধের বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করা।

(৬) অস্বাস্থ্যকর নিচুজমি ভরাট এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের উন্নতিসাধন করা।

(৭) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন ও তার পরিচালনা করা ।

(৮) চুরি ডাকাতি নিবারণে সহায়তা করা।

(৯) জনস্বাস্থ্য,জনসুবিধা প্রভৃতি সমৃদ্ধি কারক কাজ করা ইত্যাদি।

গ্রাম সংসদ

প্রতিটি নির্বাচন ক্ষেত্রে এক একটি গ্রাম সংসদ গড়ে উঠবে। গ্রাম সংসদের সভা প্রধান কতৃক আহূত হবে বছরে দুবার সভা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া জরুরি সভাও আহবান করা যাবে। এক -দশমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হয়। সভা আহ্বানের আগে গ্রাম সংসদের সকল সদস্যকে অবহিত করতে হবে । গ্রাম সংসদের প্রধান কাজগুলি হল - গ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি নির্ধারন সেই অনুসারে পরিকল্পনা রচনা, দরিদ্র দূরীকরন কর্মসূচীর জন্য উপকৃত ব্যাক্তিদের তালিকা রচনা করা , বেনিফিসিয়ারি কমিটি গঠন কর।

আয়ের উৎস

উপরিউক্ত কার্যাবলীকে সুচারুভাবে সমাধান করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস হল - সরকার প্রদত্ত আর্থিক অনুদান, কর থেকে সংগৃহীত আয়, ঋন ইত্যাদি। জমি, ঘরবাড়ি, পুকুর, পেশা, বৃত্তি, যানবাহন, গৃহনির্মান ইত্যাদির ওপর পঞ্চায়েত কর ধার্য করে থাকে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস হল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি কতৃক আর্থিক অনুদান বা সাহায্য।

তবে পঞ্চায়েতের কাজে বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও গ্রামীন মানুষের অনেক চাহিদা

অপূর্ন থেকে গেছে। এর জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারর একযোগে উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। যাইহোক, ত্রিপুরার পঞ্চায়েত ববস্থা সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে।

৪.৩ - ত্রিপুরার পৌর শাসন

টিপ্পনী

৭৪তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুসারে জনগণনাকৃত শহরে তিনপ্রকারের পৌর শাসনের কথা বলা হয়েছে। পৌর কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং নগর পঞ্চয়েত। পোর কর্পোরেশন বড়ো শহর, পৌরসভা ছোট শহর এবং নগর পঞ্চায়েত হল গ্রাম থেকে শহরে উত্তরন ঘটেছে এমন জনপদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(১) পৌর কর্পোরেশন

ভারতে গ্রামীন জনসংখ্যার আধিক্য থাকলেও শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম নয়। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মোট ৩৬০৯ টি শহর আছে এবং এই শহরগুলিতে ২১কোটি ৪০ লক্ষ মানুষবসবাস কারী জনগণের সংখ্যা হল ২৮,৫৩,৫৪,৯৫৪ অর্থাৎ জনসংখ্যার ২৭.৭৮%।

বর্তমানে পৌর কর্পোরেশন এলাকা বলতে বড়ো শহরকে বোঝায়। ত্রিপুরায় এরকম বড়ো শহরের সংখ্যা ১টি আগরতলা পৌর কর্পোরেশন।

আগরতলা পৌর কর্পোরেশন

১৮৩৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আগরতলা শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজাচন্দ্র মানিক্যের সময় কালে আগরতলা পৌর কর্পোরেশন গঠিত হয় (১৮৭১) । বর্তমানে ৪৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের নিয়ে আগরতলা পৌর কর্পোরেশনটি গঠিত। কাউন্সিলাররা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে মেয়র নির্বাচিত করে সভার কাজ পরিচালনা করার জন্য এবং একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির পদ শূন্য হলে নিজেদের মধ্যে থেকে নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

পৌর কর্পোরেশনের মেয়র

কর্পোরেশনের শাসন বিষয়ক প্রধান কতৃপক্ষ হিসেবে মেয়র কাজ করেন। তিনি পৌর কর্পোরেশনের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। মেয়র কাজ সম্পাদন করার

টিপ্পনী

জন্য একজন ডেপুটি মেয়র ও কয়েকজন মেয়র পরিষদে গঠন করেন। একে স-পরিষদ মেয়র ও বলাহয়। মেয়রের ভূমিকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ। তবে তাঁর ক্ষেত্র শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পৌর কর্পোরেশনের এলাকায় সীমাবদ্ধ।

পৌর কর্পোরেশনে ৪ ধরনের কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। যথা -

পৌর হিসাব পরীক্ষা কমিটি

কর্পোরেনের সদস্যদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এই কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হয়। এই কমিটির কাজ হল হিসেব পরীক্ষা করা। অডিটরিপোর্ট পরীক্ষা করা, অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থিত করা এবং কর্পোরেশন কতৃক অন্য যে কোনো আর্থিক কাজ সম্পাদন করা।

বরো কমিটি

মোটামুটি১০টি ওয়ার্ড নিয়ে একটি বরো কমিটি গঠিত হয়। বরো কমিটিতে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগনই থাকেন।এই কমিটির কাজ হল জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা, পার্ক, উদ্যান, রাস্তাঘাট নির্মান, বস্তি উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বরো এলাকায় কর্মরত অফিসার ও কর্মীদের নির্দেশ দান।

ওয়ার্ড কমিটি

প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড কমিটি থাকে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঐ ওয়ার্ডের কমিটির সভাপতি। ওয়ার্ডকমিটির কাজ গুলি হল ওয়ার্ডের সমস্যা চিহ্নিত করা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার সমাধান করা, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহনের তদারকি, কর প্রদানে নাগরিকদের উৎসাহ দান ইত্যাদি।

পৌর উপদেষ্টা কমিটি

মেয়র পরিষদ ৫জন সদস্য বিশিষ্ট পোর উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। এই কমিটির কাজ হল মেয়র পরিষদকে পরামর্শ দান।

আগরতলা পৌর কর্পোরেশনের কার্যাবলী

আগরতলা পৌর কর্পোরেশন ব্যাপক কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্পোরেশনের আবশ্যিক কাজগুলি হল -

(১) জল সরবরাহের স্থান নির্মান ও সংরক্ষন।

(২) অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপনের ব্যাবস্থাকরন।

(৩) রাস্তাঘাট, জনসাধারনের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান আলোকিত করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ।

টিপ্পনী

(৪) বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ সংরক্ষন।

(৫) জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরন।

(৬) জনসাধারনকে টীকা, ইঞ্জেকশন প্রদান ইত্যাদি।

কর্পোরেশনের স্বেচ্ছাধীন কাজগুলি হল

(১) পাঠাগার, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারী, পশু-পাখি সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষন।

(২) মেলা, প্রদর্শনী সংরক্ষন ও পরিচালনা।

(৩) কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

(৪) বিশ্রামগার, গৃহনির্মান, শিশু আবাস, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি নির্মান ও সংরক্ষন।

(৫) হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন ও সংরক্ষন ইত্যাদি কাজ।

(২) পৌরসভা

পঞ্চায়েত কেন্দ্র করে যেমন গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা বিকশিত, তেমনি শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে পৌরসভা বিকশিত। পৌরসভার সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যাক্তিদের রাজ্যপাল মনোনিত করতে পারেন তবে কোন পৌরসভার সদস্য বা প্রতিনিধি ৪০ এর অধিক হবে না আবার ২০ এর কম হবে না।

বর্তমানে পৌরসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যাক্তিকে কমপক্ষে ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে, বিকৃত মস্তিস্ক বা দেউলিয়া হবেন না, সরকারী

টিপ্পনী

কর্মচারী হবেন না এবং মহকুমা বা পঞ্চায়েতের সদস্য হবেন না।

পৌরসভার কার্যাবলী

১৯৯৪ সালের ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। যথা -

আবশ্যিক কার্যাবলী -

(১) পূর্ত বিষয়ক কার্যা বলী - রাস্তাঘাট, সেতু, উড়ালপুল নির্মান ও সংরক্ষন, রাস্তার নামকরন, নর্দমা ওপর প্রনালী নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন, বৃক্ষরোপন শৌচাগার নির্মানও সংরক্ষন, বাজার নির্মানও সংরক্ষন ইত্যাদি।

(২) জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যাবলী - ময়লা, আবর্জনা অপসারন, ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন, পানীয় জল সরবরাহ, টীকা ও প্রতিষেধক প্রদান,রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন, কুকুর ও অন্যান্য পশুদের উপদ্রব বন্ধ কর, শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি।

(৩) নগরোন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী - বস্তি উন্নয়ন, গৃহনির্মান, পার্ক ও উদ্যান নির্মান ও সংরক্ষন, রাস্তাঘাটের নিয়ন্ত্রন, ঐতিহাসিক সৌধের সংরক্ষন ইত্যাদি।

(৪) প্রশাসন বিষয়ক কার্যাবলী - পৌর এলাকারসীমানা চিহ্নিতকরণ, জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তকরন, পথ, সেতু প্রভৃতির অবৈধ দখলদারির দূরীকরন, পৌরসভার সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষন, দূষন নিয়ন্ত্রন, অবৈধ নির্মান রোধ ইত্যাদি।

স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী

(১) দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্পের সময় ত্রান বিতরন।

(২) মন্ত্রীদের জন্য প্রতিক্ষালয় নির্মান ও সংরক্ষন।

(৩) বৃদ্ধাশ্রম ও অনাথ আশ্রম নির্মান ও সংরক্ষন।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনও সংরক্ষন।

(৫) বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষার প্রসার।

(৬) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি সাধন।

(৭) পশু খামার নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন।

(৮) অপরিশ্রুত জল সরবরাহ।

(৯) সমবায় সমিতি নির্মান ও সংরক্ষন।

(১০) পতিত জমি উদ্ধার ও সামাজিক বনসৃজন ইত্যাদি।

টিপ্পনী

রাজ্যসরকার কতৃক হস্তান্তরিত কার্যাবলী

১৯৯৪সালে পৌর আইন অনুসারে রাজ্য সরকার বেশ কিছু ক্ষমতা পৌরসভাকে হস্তান্তরিত করতে পারে। যেমন

(১) শহর পরিকল্পনা, শহর উন্নয়ন।

(২) পরিবহন ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান কর্মসূচী।

(৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ত্রান ও সামাজিক কল্যাণ।

(৪) রাস্তাঘাট, গৃহনির্মান সহপূর্ত কাজ।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কর্মসূচী ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার।

(৬) ক্রীড়া কল্যাণ, তপশিলী জাতি ও উজপজাতি কল্যাণ।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষন ইত্যাদি।

তাই বলা যায় পৌর জনগণের আশা আকাঙ্খা একমাত্র পৌরসভাই পূরণ করতে পারে, তবেএর জন্য আর্থিক সংস্থান পাশাপাশি সদিচ্ছার প্রয়োজন।

(৩) নগর পঞ্চায়েত

১৯৯৪ সালের পৌর আইন অনুসারে সদস্য গ্রাম থেকে শহরে উত্তীর্ন অঞ্চলে নগর পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছে। নগর পঞ্চায়েতের সভাপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সাধারন ভাবে কোনো পৌরসভায় মেয়র সংশ্লিষ্ট নগর পঞ্চায়েতের সদস্য হন , তবে মেয়র ও ১০জন ওয়ার্ডের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে নগর পঞ্চায়েতে পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। নগর পঞ্চায়েতে পৌরসভা ও কর্পোরেশনের মত তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে।

টিপ্পনী

কার্যাবলী

নগরপঞ্চায়েত যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, তা হল -

(১) শহরাঞ্চলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও সাহায্য দান।

(২)নর্দামা ও পয়ঃপ্রনালী পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট আলোকিত করা।

(৩) শহরাঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র নির্মান ও পরিচালনা করা।

(৪) প্রত্যেকওয়ার্ডে জল সরবরাহ করা, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা, কালভার্ট নির্মানও সংরক্ষন ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলাপরিষদ (TTAADC)

ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলাপরিষদ একটি স্বাধীন পরিষদ। ফলে উপজাতি অঞ্চলে এই পরিষদই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতার অধিকারি। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে খুমুলভ এই উপজাতি সংস্থা (TTAADC) এর সভা ও অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলা পরিষদ ১৯৭৯ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট কতৃক আইন পাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই পরিষদ ১৯৮৫ সালে ৪৯ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে যুক্ত হয়।

ত্রিপুরায় প্রায় ৬৮ শতাংশ এই পরিষদের অন্তর্গত এবং TTAADC ৭,১৩২.৫৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বিস্তৃত। এই পরিষদের ৭০ শতাংশ অঞ্চল পার্বত্য ভূমি এবং এই পরিষদের জনসংখ্যা ৩,৬৭৩,৯১৭ (২০১১এর জনগণনা অনুসারে), ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার প্রায়৮০ শতাংশ এই পরিষদের অন্তর্গত।

ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলা পরিষদ (TTAADC) ৩০ জন প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ৩০ জনের মধ্যে ২৮ জন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং বাকি ২জনকে রাজ্যপাল মনোনীত করেন। আর ২৮জন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৫ জন তপশিলী উপজাতি থেকে নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদে একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক কমিটি বর্তমান।

ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলা পরিষদ (TTAADC) আইন

সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন করে থাকে যেমন -

আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

এই পরিষদের আইন বিভাগের প্রধান হলে সভাপতি। তিনি কোন সভা আহ্বান করতে পারেন, নিদিষ্ট সময় অন্তর সভার মাধ্যমে অগ্রগতির পর্যালোচনা করে থাকেন, আর্থিক ব্যায় বরাদ্দের অনুমোদন দেন, এছাড়াও কোনো বিল এবং আইন ও অনুশাসন পাশ করার মাধ্যমে আইন বিভাগকে পরিচালনা করেন।

প্রশাসনিক ক্ষমতা

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসিক দায়িত্ব বর্তায় প্রশাসনিক কমিটির উপর। এই কমিটি কাজপরিচালনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করে থাকেন। প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক, উপপ্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়োগ করে থাকেন। এছাড়া প্রশাসন, অর্থ, গ্রামীন উন্নয়ন পরিকল্পনাও সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যাপক কার্যাবলী পরিচালনা করা ইত্যাদি।

সুতরাং ত্রিপুরায় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পাশাপশি ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলা পরিষদের উপস্থিতিএক অনন্য চরিত্রের সৃষ্টি করেছে। তাই বলা যায়, এই পরিষদ ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে।

৪.৫ - অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস কী?

(২) সভাপতি ও সহ সভাপতি কারা এবং কিভাবে নির্বাচিত হন?

(৩) সভাধিপতিও সহসভাধিপতি কিভাবে নির্বাচিত হন?

(৪) উপজাতি উন্নয়ন পর্ষদ কী?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী

(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর?

(২) পঞ্চায়েত সমিতির গঠন ও কার্যাবলীগুলি লেখ?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(৩) জেলা পরিষদের ভুমিকা কী?

(৪) পৌরসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর?

(৫) আগরতলা কর্পোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী লেখ?

(৬) ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বশাসিত জেলা পরিষদ সম্পর্কে টীকা লেখ?

৪.৬ - নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(১) রাজশ্রী বসু 'জনপ্রশাসন' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১০

(২) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, "পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা" প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১১

(৩) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, "পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভা : বিবর্তন থেকে নির্বাচন" প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা - ২০১২

(৪) https://en.m.wikipedia.org>wiki

(৫) www.tripurainfo.com>info>Archivedet

(৬) The Tripura Municipality Act, 1994

(৭) The Tripura Panchayet Act, 1993